বুদ্ধির মুক্তি–
নব্যমানবতাবাদ

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

বুদ্ধির মুক্তি–নব্যমানবতাবাদ

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক:

আচার্য সুগতানন্দ অবধূত কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব
আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর
কলকাতা–৭০০ ১০০প্রথম সংস্করণ: ১লা এপ্রিল, ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ: ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯১

তৃতীয় মুদ্রাঙ্কন: আনন্দপূর্ণিমা, ২০১৩

মুদ্রাঙ্কন: আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১ সি, মোহনবাগান লেন,
কলকাতা–৭০০ ০০৪

অক্ষর বিন্যাস: তরুণ ভৌমিক

প্রাপ্তিস্থান:প্রভাত লাইব্রেরী ৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা–৭০০ ০০৯

ISBN-978-81-7252-347-3

মূল্য: ৪৫.০০ টাকা মাত্র

চরম নির্দেশ

“ যে দু’ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু’ৰেলা সাধনা করতেই হবে - ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম-নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম-নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ’ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।”

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	aḿ	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ka	kha	ga	gha	uṋa	ca	cha	ja	jha	iṋa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
t́a	t́ha	d́a	d́ha	ńa	ta	tha	da	dha	na

প ফ ব ভ ম

प फ ब भ म

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

an̯ jin̯a rśi cháya jin̯ána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d ḍ e g h i j k l m ṁ n ṅ ṇ o p r s ś t ṭ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ऌ	त्	अँ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ऌ	ৎ	अँ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṇ

সূচীপত্র

ভক্তিতত্ত্ব ও নব্যমানবতাবাদ; ৰন্ধন ও সমাধান

ভৌম ভাবপ্রবণতা ; ভাবসম্পদচ

জৈব সত্তা ও মানসিকতা ; সমসমাজতত্ত্ব;

শোষণ ও অসংস্কৃতি; মেকি মানবতাবাদ;

জাগ্রত বিবেক নোতুন প্রজন্মের পাথেয় ;

নব্যমানবতাবাদই শেষ আশ্রয় ;

ভক্তিতত্ত্ব ও নব্যমানবতাবাদ

এর আগের দিন বলেছিলুম যে বৈষয়িক সামঞ্জস্যের সঙ্গে পরমাগতির সন্তুলনের (subjective approach through objective adjustment) ভেতর দিয়ে মানুষ ভক্তির পূর্ণত্বে পৌঁছয়। আরও বলেছিলুম কীরকম ভাবে–কীভাবে নানান মানসিক অভিব্যক্তির ভেতর দিয়েই ভক্তির বিকাশ হয়। এখন যেটা ইন্ট্রোভারস্যাল অর্থাৎ পরমাগতি আর যেটা এন্ট্রোভারস্যাল অর্থাৎ বৈষয়িক সামঞ্জস্যের দিক–এদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা ভালভাবে জানা দরকার, স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।

মানুষ অন্তর্জগতে অর্থাৎ ভাবজগতে যে এগিয়ে চলেছে, তার যে আস্তিত্বিক নিষ্পন্নতা ঘটছে সেটা ছন্দায়িত। আর বাইরের জগতে যা ঘটছে তার কিছুটা অন্তর্লোকের ছন্দের সঙ্গে সন্তুলিত, কিছুটা নয়। যেখানে সেটা সন্তুলিত নয় সেখানে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। তোমরা ব্যষ্টিগত জীবনে কোন কোন গোষ্ঠার আট/দশ জন মানুষের একটা গ্রুপের মধ্যে থাকলে কখনো খুৰ অস্বস্তি বোধ কর, কখনো খুৰ ভাল লাগে। কারণ সেই

গ্রুপের বাইরের জগতে যে চলার ছন্দ, বেঁচে থাকার ছন্দ, তার সঙ্গে তোমার অন্তর্জগতের যেখানে পরিপোষকতা ঘটে তোমার সেটা ভাল লাগে, যেখানে ঘটে না সেখানে তোমার ভাল লাগে না। তাই ৰাইরের জগতে কীভাবে চলবে ও অন্যকে কীভাবে চলতে সাহয্য করবে সে সম্বন্ধে মানুষের একটা খুৰ স্পষ্ট নীতি, একটা স্পষ্ট দর্শন, একটা স্পষ্ট দার্শনিক সংরচনা থাকা দরকার। সমাজে এটার অভাব ঘটে....অনেক সময়েই অভাব ঘটে। তাই মানুষ সামাজিক জীবনে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যে মানুষ বৌদ্ধিক জগতে বৈদুষ্যে এগিয়ে চলেছে, বাইরের জগতে সে যখন উল্টোটা দেখে সে তখন মানিয়ে চলতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে বৈদুয্যে মানুষ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। কিন্তু বাইরের জগতে এই অ্যাজাষ্টমেন্ট–এই সন্তুলনটা ঘটাতে পারছে না। সেজন্যে বর্তমান শিক্ষিত জগতে উন্মাদ রোগী–মানসিক বিকারগ্রস্ত লোেক বেড়ে চলেছে। তার এটাই কারণ। ভেতরের জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের দ্রুতির (speed) সামঞ্জস্য নেই। শুধু দ্রুতিরই নয়, ছন্দেরও সামঞ্জস্য নেই। মন যে ছন্দে ছন্দায়িত ৰাইরের জগৎ সে ছন্দে ছন্দায়িত নয়। তার ফলেই এই সংঘর্ষটা দেখা দেয়। আর সংঘর্ষটা স্থূল

জগতে যতটা হয়, মানস জগতে হয় তার থেকে অনেক বেশী। তার ফলে মানুষ মানসিক সন্তুলন হারিয়ে ফেলে।

তোমরা জান, পৃথিবীতে অনেক তত্ত্ব এসেছে। কোন কোন তত্ত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগৎকে নিয়েই ছিল। আধ্যাত্মিক জগৎকে নিয়ে ছিল কিন্তু মানসিক জগতের যৌক্তিকতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। সে সৰ তত্ত্ব আজ অতীতের অন্ধকারের আবর্জনায় হারিয়ে গেছে। মানসিক জগতে যেগুলো ছিল তারা অনেক সময় মানসিক সাম্য (mental equipoise) ৰজায় রাখতে পারেনি। সে চলে গেছে। স্থূল জগতের ছন্দ, স্থূল জগতের দর্শন–অনেক সময় দেখা গেছে যে যা দর্শন হিসেবে শুণতে ভাল লাগছে, ধরিত্রীর কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারছে না। অর্থাৎ সেটা তত্ত্বের আকাশেই চরে বেড়াচ্ছে, বাস্তবের দুনিয়ায় তার সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক তত্ত্ব শুণতে বেশ ভাল লাগত। সৰাইকার মধ্যে সমতার কথা সে সৰ দর্শন বলেছিল, কিন্তু বৈবহারিক জগতে দেখা গেল, সেগুলো কাজে লাগছে না, কারণ সেই দর্শনের মৌল নীতি ধরিত্রীর প্রকৃতিগত মৌল

নীতির বিরুদ্ধে। 'বৈচিত্র্যং প্রাকৃতধর্ম-সমানং ন ভবিষ্যতি'। অর্থাৎভক্তিতত্ত্ব ও নব্যমানবতাবাদ পৃথিবীতে রয়েছে নানান রূপের খেলা-নানান ছন্দের সমারোহ-সে কথাটা ভুলে গেলে চলে না, চলবে না, চলেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণাঢ্য সমারোহ মানুষকে তাক লাগিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে দ্রুতি নেই; চলমানতা নেই। অথচ এই চলমানতা অস্তিত্বের গোড়ার কথা-শেষের কথা। চলমানতা যার নেই সেটা তো বদ্ধ জলাশয়ের মত (It is just like a stagnant pool.)। জলাশয়ে যদি স্রোত না থাকে, তরঙ্গের উচ্ছ্বাস না থাকে তাতে পানার ভীড় হয়। সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। সেই পুকুরকে মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়াই ভাল। অতীতে অনেক দর্শন এই কাণ্ডটি করে গেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে তা' ভাবজড়তার পঙ্কিলতায় মানুষকে আবদ্ধ করে রেখেছে। তা থেকে অজস্র মশকের উৎপত্তি হয়েছে, মানুষের কল্যাণ হয়নি।

ভক্তিতত্ত্ব মানুষের সবচেয়ে দামী সম্পদ। "নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্"-এ ৰলেছি, কৃষ্ণ হচ্ছেন অন্তর্লোকের বৈদুর্যমণি। ভক্তি জিনিসটা সকল মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ। তাই সেই সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। সে

ভাবলোকের জিনিস। তাকে রক্ষা করতে গেলে জড়লোকে তার চার পাশে একটা বেড়া দিতে হয়, গার্ডার দিতে হয়। ছোট বৃক্ষকে–ক্ষুদ্র তরুকে বাঁচাতে গেলে যেমন একটা বেড়া দিতে হয়, গার্ডার দিতে হয়, তেমনি করতে হয়। আর এই গার্ডারটা হচ্ছে কী?-না, লৌকিক জগতের এমনই একটা দার্শনিক তত্ত্ব যা মানুষকে ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে জড়লোকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে ও এগিয়ে চলার সম্প্রেষণা জুগিয়ে চলবে অনন্তকাল ধরে। বাইরের জগতে যে ভাবাবেগ কেবল মাটিকে বেন্দ্র করে থাকে তাকে কী ৰলি?-না, ভৌম ভাবাবেগ (geo-sentiment)। এই ভৌম ভাবাবেগ বা ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে দেশাত্মবোধ (geo-patriotism), ভৌম অর্থনীতি (geo-economics), ভৌম অনেক কিছুই গড়ে উঠতে পারে, এমনকি ভৌম ধর্মমত (geo- religion) পর্যন্ত। তা এই যে ভৌম ভাবাবেগ, এই ধূলির ধরণীর একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে মানুষকে আটকে রাখতে চায়, অথচ তার অন্তর্লোকে সে চায় উদার পরিব্যাপ্ত হতে।

মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ যে ভক্তিতত্ত্ব (devotional senti- ment) তা কী করছে?-না, লোকায়ত আস্তিত্বিক অনুভূতিকে লোকোত্তর পরমানুভূতিতে মিলিয়ে

মিশিয়ে দিচ্ছে। তাই এই লোকায়ত তত্ত্বে যদি খণ্ডত্ব প্রকট হয়ে ওঠে যাকে বলেছিলুম ভৌম ভাবাবেগ, তা' হলে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের ভারসাম্য নষ্ট হতেই হবে। শেষ পর্যন্ত সৰ কিছু থাকা সত্ত্বেও সে কাঙাল হয়ে যাবে, তার কোন কিছুই থাকৰে না–সে রিক্ত, সর্বহারা, নিঃস্ব হয়ে যাবে। আর এই যে ভৌম ভাবাবেগ, তা অতীতে অনেকের–অনেক জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করে দিয়েছে। তাই বিদগ্ধ মানুষ ভৌম ভাবাবেগ থেকে দূরে থাকৰে আর তাদের উচিত, এই ভৌম ভাবাবেগের ওপর ভিত্তি করে যা' কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে কখনো সমর্থন না করা (They should support nothing which is based on this geo-sentiment.)। তা' ভক্তিকে কলুষিত করে দেবে, মানুষকে মানুষ হিসেবে ছোট করে দেবে।

এর চেয়ে হয়তো একটু বড় ভাবাবেগ বা সেন্টিমেন্ট রয়েছে। সেটা কী? না, সামাজিক ভাবাবেগ (socio-sentiment)। মাটিতে আটকে নেই, একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীতে আটকে রয়েছি। সেই জনগোষ্ঠী–কেন্দ্রিক কল্যাণ চিন্তা করছি, আর সেই জনগোষ্ঠী–কেন্দ্রিক কল্যাণ

চিন্তা করতে গিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীর কল্যাণের বিরুদ্ধে যাচ্ছি—ৰাধা দিচ্ছি, তার স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে ফেলছি। এ হয়তো বা ভৌম ভাবপ্রবণতার চেয়ে কিছুটা ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাল নয়। এই সামাজিক ভাবপ্রবণতা পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত ঘটিয়েছে, অনেক মন কষাকষি তৈরী করে দিয়েছে, মানুষকে মানুষের থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে শেষে একটা ক্ষুদ্র ভাবজড়তায় পরিণত করে দিয়েছে। সে আর বৃহৎ নদী নয়-সে জীবন্ত প্রাণবন্ত স্রোতস্বিনী আর নয়।

এর পরেও মানুষের আরেকটা সেন্টিমেন্ট আছে। সেটা কী?-না, হিউম্যান সেন্টিমেন্ট-মানবিক ভাবপ্রবণতা। এমন অনেক লোক পৃথিবীতে এসেছিলেন যাঁরা মানুষের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন। তারপরে বেশ ভাল করে বসে ভাষণের পরে কাঁচা ঈলীশের ঝাল খেয়েছেন যেন ওই ঈলীশটার মরতে কষ্ট হয় নি; কই মাছের পাতুড়ি খেয়েছেন, যেন মারৰার সময় কই মাছটা ক্যা-ক্যা করে চিৎকার করে নি; যে মানবিক ভাবপ্রবণতা-এটা মানুষ ছাড়া অন্য জীবের স্বার্থের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আর সেটাকে অন্যায় কাজ ৰলে তাঁরা ভাবেন নি।

আমি কোন একটা বইয়ে পড়েছিলুম, কোন একজন বড় মহাত্মা (saint)-তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন– কেবল "মধুতে ডুৰাইয়া ফড়িং খাইয়া থাকিতেন," যেন ক্ষুদ্র ফড়িংটার প্রাণ নেই—তার মধ্যে যেন প্রাণীনতার ছন্দ নেই। হ্যাঁ, মানুষকে যুক্তি ৰুঝে চলতে হবে, অস্তিত্বকে ৰজায় রেখে চলতে হবে। একথা ঠিকই যে "জীবঃ জীবস্য ভোজনম্"। এই যে আমরা শাক–সব্জী খাচ্ছি তার ভেতরেও কি জীবন্ত কোষ (liv- ing cell) নেই? নিশ্চয় আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যা কিছু নির্দেশনা আমি আমাদের বইয়ে (জীবন বেদ) দিয়েই দিয়েছি। এই যে মানবতাবাদ–এর ভেতরে যে প্রাণীন সত্তা রয়েছে সেই প্রাণীনতা বা প্রাণীন ছন্দ মানুষকে মানবতাবাদে প্রেষিত করেছে, মানবতাবাদে আকৃষ্ট করেছে। সেই সত্তাৰোধটা সে যদি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে তবেই মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বটা সার্থক হৰে। আর এই ছড়িয়ে দিতে গেলে এই যে সৰ কিছুকে আপন বলে ভেবে চলা–এই যে মানবতাবাদ, এর পেছনে থাকা উচিত আরেকটা সত্তা যে

সত্তাটা মানবতাবাদকে দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেৰে, প্রাণীনতায় উচ্ছল করে সকল জীবের অন্তরকে স্পর্শ করবে– সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলবে।

"বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ।।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু–পরমাণু–সরেণু সেই এক বিষ্ণুরই অভিব্যক্তি। এই কথা মনে রেখে, এই ভাবাবেগটা চিরজাগ্রত যিনি রাখেন তাঁরই অস্তিত্ব সার্থক। তিনিই যথার্থ ভক্ত, তাঁর মধ্যেই ডিভোশান্যল কাল্ট হিসেবেই সীমিত থাকে না, সেটা ডিভোশান্যাল সেন্টিমেন্ট–ডিভোশান্যাল মিশনে রূপান্তরতি হয়ে গেছে। তাই এই ভাবকেন্দ্রের জিনিস যা মানবতাবাদের মূল ধারাটুকুকে মানবের মধ্যে আটকে না রেখে বিশ্বের চর–অচরে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমি তারই নাম দিয়েছি নব্য–মানবতাবাদ (neohumanism)। এই নব্যমানবতাবাদই মানুষের মানবতাবাদকে বিশ্বৈকতাবাদে–সর্বজীবে ছড়িয়ে

দেবে। তাই মানুষের সাধনা হচ্ছে কী?-না, সাবজেক্টিভ্ এ্যাপ্রোচ থাকছে–ভেতরের দিকে, পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরের দিকে নব্যমানবতাবাদী ভাবাদর্শের দ্বারা মানবতাবাদকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে বিশ্বৈকতাবাদের সংরচনা তৈরী করে চলেছে। এইটাই মানুষকে করে যেতে হবে, নইলে ভেতরের যে অগ্রগতি সেটা ভৌম ভাবাবেগের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সন্তুলন রাখতে পারবে না–ভারসাম্য (equilibrium) ৰজায় রাখতে পারৰে না। সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল তার ভক্তিতত্ত্ব–তার ডিভোশান্যল প্রপারটি, তার ডিভোশান্যাল ওল্টস্ (wonts)। যেভাবে হোক এই ভক্তিসম্পদকে বাঁচাতেই হবে, নইলে মানুষের সৰ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে।

বর্তমান পৃথিবীর মানুষ বৌদ্ধিক জগতে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। সুতরাং আমরা আমাদের এই সর্বোচ্চ প্রাণী সম্পদকে কিছুতেই নষ্ট হতে দোৰ না। যখনই দেখৰ ৰাইরের চাপ এই প্রাণী সম্পদকে আঘাত দিচ্ছে তখনই পরমপুরুষকে ৰলৰ, "আমার এই প্রাণীন্ সম্পদকে তুমি বাঁচাও, আমার এই প্রাণীন্ সম্পদকে সামূহিক বিনষ্টি

থেকে বাঁচাও- ৰাঁচাও আমায় এই সর্বরিক্ততার অবযন্ত্রণার হাত থেকে।'

(কলকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২)

সূচীপত্র

ৰন্ধন ও সমাধান

সেদিন বলছিলুম ভক্তিতত্ত্ব ও মানবতাবাদের কথা। ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে ৰলতে চাইছিলুম যে বাইরের জগতের কতকগুলো অসঙ্গতির জন্যে ভেতরের ভক্তিতে আঘাত লাগে। সেই আঘাতটা যাতে না আসে সেই জন্যেই পরমপুরুষের কাছে বলতে হবে-"আমাকে এই সমস্ত বিপত্তিগুলোর হাত থেকে তুমি বাঁচাও-বাঁচাও আমার এই অমূল্য সম্পদগুলোকে।" ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে আমি এও বলেছি

ভক্তিকে শুধু 'কাল্ট' হিসেবে নয়, শুধু 'প্রিন্সিপ্ল্' হিসেবে নয়, ভক্তিকে নিতে হবে জীবনের 'মিশন' হিসেবে, জীবনের সর্বোচ্চ ব্রত হিসেৰে। ভক্তি মানুষের মনুষ্যত্বকে মানবত্বকে সূক্ষ্মত্বের দিকে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষকে একটা আনন্দঘন সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সেইজন্যে শাস্ত্রে ভক্তিকে 'পুষ্টিমার্গ'ও বলে, অর্থাৎ যাতে মানুষের সত্তাটা পুষ্ট হয়, মানুষের মন

ক্রমশঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়, ক্রমশঃ মানুষ জীবনে অধিক থেকে অধিকতর

আনন্দ পেতে থাকে, জীবনটা আনন্দময় হয়ে ওঠে। তা না হ'লে জীবনটা ছন্দহীন হয়ে যায়, জীবনে সুখ-শান্তি থাকে না। সেজন্যে মানুষ যদি ৰাইরের দিকে বেশী চলে তা হলে মানুষ শেষ হয়ে যায়। এ যেন সেই তালের আঁটি থেকে কল বেরুচ্ছে। কলটা ছুটে চলেছে বাইরের দিকে কিন্তু ভেতরের দিকে পুষ্টিমার্গের অভাব রয়েছে। প্রথমটাই তার ভেতরটা ফোঁপরা হয়ে যায়, তারপর সে

তিলে তিলে মাটিতে মিশে যায়, তারপর তার সামগ্রিক সত্তাটাই নস্যাৎ হয়ে যায়।

বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশেই "সিনিসিজম্" ব্যাপকভাবে দানা বাঁধছে। আর বাইরের জগতে যারা এই ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় সে সম্বন্ধে আমি বলেছিলুম যে প্রথম হচ্ছে ভৌম ভাবপ্রবণতা (geo- sentiment)। এখন মানুষকে যখন নিজের আন্তর সত্তাকে পুষ্টির দিকে নিয়ে যেতে হবে–মানবত্বকে ঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, অর্ধেক– মানুষ (demi-man), সিকি–মানুষকে পূর্ণ মানুষে পরিণত করতে হবে। তখন এই জিও–সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে ব্যষ্টিগত জীবনেও চলতে হবে। আর সাধারণ মানুষও যাতে কোন জিও–সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সেইজন্যে বুদ্ধিমান ব্যষ্টিকে মুখর হতে হবে–চুপ করে থাকলে চলৰে না। 'গুডি–গুডি বয়' (শান্তশিষ্ট ন্যাজ্ বিশিষ্ট, পষ্ট বলতে ৰেজায় কষ্ট) হিসেৰে যা কিছু মন্দ দেখছি, সয়ে যাচ্ছি–এ করলে চলবে না।

এই যে জিও-সেন্টিমেন্ট-আমি বলেছিলুম, এই জিও-সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে জিও-প্যাট্রিওটিজ়ম্ (ভৌম দেশাত্মবোধ), 'জিও-রেলিজন' (ভৌম ধর্মমত), 'জিও-ইকনমিক্স' (ভৌম অর্থনীতি), জিও অনেক কিছু দাঁড়িয়ে থাকে বা থাকতে পারে। আর এই সবগুলোই মানুষের আন্তর সত্তায় আঘাত হানে। তাই মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে মানুষের এই দামী সম্পদ-এই ভাবসম্পদ (inner assets) নষ্ট না হয়। বলা হয়ে থাকে-

"পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং জগতো নাস্তি পাতকম্।
মৌনিনাং কলহো নাস্তি ন ভয়ং চাস্তি জাগ্রতঃ।।"

-ওগো চালাক মানুষ, তুমি যদি মূর্খ হতে চাও তার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল পড়াশোণা ছেড়ে দাও। ওগো চালাক মানুষ, তুমি যদি পাপী হতে চাও তার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল তুমি ব্যথা-বেদনা ভুলে যাও। ওগো চালাক মানুষ, তুমি যদি কলহ এড়িয়ে সুখে বাস করতে চাও তৰে মৌনী হয়ে থাক, আর যদি বিপদের হাত থেকে বাঁচতে চাও তো চোখ-কাণ মেলে থাক।

এই জিও–সেন্টিমেন্টের মোকাবিলা করৰার সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সৰচেয়ে মজবুৎ ভূমি হচ্ছে কী?-না, বিচারপ্রবণ মানসিকতা (ration- alistic mentality)। এই বিচারপ্রবণ মানসিকতা গড়ে তুলতে হয় দু'ভাবে। নানান ধরণের 'ষ্টাডিজ'-এর মাধ্যমে–যাকে আমরা বলি 'পাঠ', যাকে আমরা বলি 'স্বাধ্যায়'। তাহলে যে মানুষটা পড়তে জানে না সেকি যুঝবে না এই জিও–সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে? নিশ্চয় যুঝৰে। সে অন্যের মুখ থেকে শুণৰে। যে বুঝেছে সে আরও বিশ জনকে বোঝাবে। সুতরাং এইভাবে সবাই বিচারপ্রবণ মানসিকতা গড়ে তুলতে পারবে ও জিও–সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে ও ভাবসম্পদের যে প্রথম বেড়া নিজেকে বাঁচাবার সেটাকে মজবুৎ করে তুলতে পারবে আর মানব সমাজে সে বরণীয় হয়ে উঠবে কী ভাবে?-না, নিজেকে জিও–সেন্টিমেন্টের ঊর্ধ্বে তুলে আর অন্যকে জিও–সেন্টিমেন্টের ঊর্ধ্বে তুলবার প্রয়াসের মাধ্যমে।

এখন এই যে বিচারপ্রবণ মানসিকতা, এটা কীভাবে হয় তা আমি ভালভাবেই বুঝিয়ে দিলুম। আগে বোঝালুম যে জিও–সেন্টিমেন্ট কেবল একটা একপেশে একতরফা সেন্টিমেন্টই নয়, এটা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই শেকড় ছড়িয়ে বেড়ায়; আর একটা বৃহৎ অট্টালিকাতে একটা ৰটগাছ যদি শেকড় ছড়িয়ে দেয় সেই অট্টালিকাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাই মানুষের যে মানবিক সম্পদ সেটাও নষ্ট–বিনষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং তাকে বাঁচাতে হবে বিচারপ্রবণ মানসিকতা গড়ে তুলে।

এর পরেও বলছিলুম অন্যান্য সেন্টিমেন্টের কথা– প্রধানতঃ সোসিও– সেন্টিমেন্ট (socio-sentiment) বা গোষ্ঠীভিত্তিক ভাবপ্রবণতা। তার পরে হচ্ছে একটা সাধারণ হিউম্যানিষ্টিক সেন্টিমেন্ট–তাও ভাল নয়। এখন, এ যে সোসিও–সেন্টিমেন্ট–তাও ভাল নয়। তা এই যে সোসিও– সেন্টিমেন্ট–এরই ভিত্তিতে তৈরী হয় সোসিও–প্যাট্রিওটিজ়ম্ (socio-patriotism), সোসিও–রেলিজন (socio-religion), সোসিও–ইকনমিক্স (soico- conomics), সোসিও–আর্ট আর্কিটেক্চার লিটারেচার ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠীর এইটা দেবতা, আর ওই দেবতা বলে গেছেন "তোমাদের দেবতার মত জনদেবতা পৃথিবীতে হয় না।

আর তোমাদের মত ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট জনগোষ্ঠীও পৃথিবীতে হয় না। এই জিনিসগুলো হ'ল সোসিও–রেলিজন। এই রকম সোসিও–প্যাট্রিওটিজ়ম্ হয়, সোসিও–ইকনমিক্স হয়।– অন্য একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায় যাক্, আমি ওই দেশটা জয় করে ওই দেশের প্রাণরস শোষণ করব–অন্য ভাষায় যাকে ফ্যাসিজিও (fas- cism) বলতে পারি–এইগুলো হ'ল সোসিও–সেন্টিমেন্ট। অন্যে ধ্বংস হয় হোক, আমি অন্যের প্রাণরস চুষৰ–এই হ'ল সোসিও–সেন্টিমেন্ট।

এই সোসিও–সেন্টিমেন্টের হাত থেকে বাঁচতে গেলে কী করতে হবে? এর হাত থেকে বাঁচবার একটাই পদ্ধতি আর সেই পদ্ধতিটা কী?-না, প্রাক্–সম আধ্যাত্মিক প্রবণতা বা প্রোটো–স্পিরিচুয়্যালিষ্টিক মাইণ্ড (proto- spiritualistic mind) গড়ে তোলা। এই প্রোটো–স্পিরিচুয়্যালিষ্টিক মাইণ্ডের আধারভূমি হ'ল সম–সমাজতত্ত্ব। মানুষ যখন মনে প্রাণে এই সম–সমাজতত্ত্বটা বুঝে নেয়, তখন থেকেই তার মধ্যে একটা প্রাক্–সম আধ্যাত্মিক মানসিকতা (proto-spiritualistic mentality) গড়ে উঠতে থাকে–একটা প্রাক্–সম আধ্যাত্ম–মানসিক সংরচনা (proto- spiritualistic

psychic structure) গড়ে উঠতে থাকে। তাই সম-সমাজতন্ত্রটা হ'ল অত্যন্ত দামী জিনিস যা সেন্টিমেন্টের সঙ্গে যুঝতে পারে-অন্য কোন পথ নেই। আর যদি কেউ সম-সমাজতন্ত্রটাকে এড়িয়ে গিয়ে ভাবে-আমি ধার্মিক হৰ, আমি ভক্ত হব, আমি সমাজের ভাল কাজ করব, কিন্তু পাপের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করৰ না—সে তা পারবে না। অর্থাৎ সম-সমাজতন্ত্রটিকে ডিঙ্গিয়ে চলবার অপচেষ্টা যদি কেউ করে সেটা হ'ল কেমন; না, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা (just plac- ing the cart before the horse)। গাড়ী ঘোড়ার পিছনে থাকে। গাড়ীটাকে ঘোড়ার সামনে এনে দিলে যেমন অবস্থা হৰে তেমনই, কারণ এই যে সম-সমাজতন্ত্র এটা শেখাচ্ছে যে ধর্মের ভিত্তিভূমি হ'ল-সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলৰ।

"বিশ্বজনের পায়ের তলে
ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে

লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।।"

–রবীন্দ্রনাথ

এই হ'ল সম–সমাজতত্ত্বের গোড়ার কথা–শেষের কথাও। তাই এই যে সম–সমাজতত্ত্ব–এটা হ'ল ভিত্তি। আর এর ওপর দাঁড়িয়ে চলমানতাকে অক্ষয় রেখেছে, অক্ষুণ্ণ রেখেছে কে?-না, প্রাক্–সম আধ্যাত্ম–মানসিক সংরচনা (proto-spiritualistic psychic structure)-প্রাক্–সম আধ্যাত্মিক মানসিকতা (proto-spiritualistic mentality)। এই প্রোটো– স্পিরিচুয়্যাল মেন্টালিটি তরঙ্গায়িত হয়ে এগিয়ে চলেছে অশেষভাবে। সে তরঙ্গের শেষ নেই—তার দিক–দিগন্ত নেই–চলছে অনাদি থেকে অনন্তের দিকে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, কারো তাকে বাধা দেবার সামর্থ্য নেই। আর পরম পুরুষও চান, এই প্রোটো–স্পিরিচুয়্যালিষ্টিক সিষ্ট্যান্টিক মুবমেন্ট (proto-spiritualistic systalitic movement-প্রাক্–সম আধ্যাত্মিক সংকোচবিকাশী গতিধারা) এগিয়ে চলুক, এগিয়ে চলতে চলতে পরম পুরুষের চরণে এসে মিশে যাক।

এই যে প্রোটো-স্পিরিচুয়্যালিটি-এ যখন চলছে ভেতরে তখন কী হচ্ছে?-না, 'ভক্তি এ্যাজ় এ কাট্' (bhakti as a cult) তখন 'ভক্তি এ্যাজ এ প্রিন্সিপল্-য়ে (bhakti as a principle) রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর এর দ্বারাই সোসিও-সেন্টিমেন্টগুলোকে মানুষ যুঝে নেবে- হাসতে হাসতে যুঝে নেবে।

তার পরে আসে তথাকথিত মানবতাবাদ (so-called humanism) যে মানবতাবাদের পেছনে কোন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস (perennial source of inspiration) নেই। আর যে হিউম্যানিজমের পেছনে কোন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস নেই সেই হিউম্যানিজ়ম্ যতটা লোকদেখানো ততটা আন্তরিক নয়। সে মাঝপথে গিয়ে থেমে যেতে পারে, মরুভূমিতে গিয়ে শুকিয়ে যেতে পারে-'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা' এই অবস্থা তার হয়ে যেতে পারে। তাই এর পেছনে চাই একটা সর্বক্ষণিক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস (constant and perennial source of inspiration) যাকে বলছি নব্যমানবতাবাদ (neohumanism)। এই নব্যমানবতাবাদ যখন বাইরে এসেছে তখন ভেতরে হয়েছে কী?-না, ভক্তি ব্রত হিসেবে (devotion as a

mission), মার্গ হিসেবে আধ্যাত্মিকতা (spirituality as a cult) সেই প্রেরণার উৎস হয়েছে। এই প্রেরণাটিকে, এ ইস্পিরেশান্টাকে ৰলি নব্যমানবতাবাদ আর তার উৎসটাকে, সোর্সটাকে বলি 'স্পিরিচুয়্যালিটি এ্যাজ় এ কাল্ট'। আর এই যে নব্যমানবতাবাদ বা নিওহিউম্যানিজম্—ৰলেছি, এটা একটা মুবমেন্ট যখন তা সর্ব প্রেষণায় সৰ কিছুকে উচ্ছ্বসিত করছে–সৰ কিছুকে মাধুর্যমণ্ডিত করছে, একক জীবনকে বহু জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ধূলার ধরণীতে স্বর্গলোকের উত্তরণ ঘটাচ্ছে তখন সেই যে চরম পরিপূর্তির অবস্থা, সেই অবস্থাটাই হ'ল কী?-না, স্পিরিচুয়্যালিটি এ্যাজ় এ মিশন (spirituality as a mission)। অর্থাৎ মানব জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে যা উত্তরণের উৎস, যা সর্ব উত্তরণের মূল উৎস তা হ'ল স্পিরিচুয়্যালিটি–স্পিরিচুয়্যালিজম্ নয়, স্পিরিচুয়্যালিটি এ্যাজ এ মিশন।

সেদিন বলেছিলুম, অন্তরের ভারসাম্য বাইরের যে তত্ত্বগুলো নষ্ট করে দেয় তাদের সম্বন্ধে। আজকে বললুম, যে পদ্ধতিগুলো অন্তরের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় তাদের প্রতিহত করবার মানসাধ্যাত্মিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে। আর

এইভাবে যে মানুষ এগিয়ে চলে সে তার অন্তরকে দ্যুতিময় করে, আর তার দ্যুতিতে তার দ্যোতনায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড–সকল মানবের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর তখন সে মানুষ যে জিনিসটার সংস্পর্শেই আসে সহজেই সে তখন বুঝতে পারে, কোন্ জিনিসটা আসল সোণা আর কোন্ জিনিসটা নকল সোণা। সেই মানুষের ওপর বিশ্ব–মানব ষোল আনা নির্ভর করতে পারে। তার জয় অনিবার্য।

(কলকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২)

সূচীপত্র

ভৌম ভাবপ্রবণতা

মানবতাবাদ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। দর্শনের এটা একটা গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আজ জগতের মানুষের যা সবচেয়ে বড় সম্পদ–ভক্তি ও ঈশ্বরনিষ্ঠা, তা বাইরের আঘাতে বার

বার নষ্ট হয়.....হবার উপক্রম হয়, আর সেই আঘাতগুলোকে প্রতিহত করবার মত রসদ মানুষের থাকা দরকার।

এই জিও–সেন্টিমেন্ট, সোসিও–সেন্টিমেন্ট–এদের কোন্টার বিরুদ্ধে কীভাবে যুঝতে হয়, কীভাবে নিজের অন্তরের পবিত্র ভাবসম্পদগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় সে সম্বন্ধে গত রবিবারে বলেছি।

এখন দেখা যাক্ এই যে বিভিন্ন ধরণের সেন্টিমেন্ট–জিও–সেন্টিমেন্ট, সোসিও–সেন্টিমেন্ট, এমনকি তথাকথিত মানবতাবাদী ভাবপ্রবণতা (so- called human-sentiment) এই জিনিসগুলো কী মানুষের অস্তিত্বটা যতটা না পাঞ্চভৌতিক তার চেয়ে বেশী মানসিক। অন্যান্য জীবজন্তুর সত্তা মুখ্যতঃ পাঞ্চভৌতিক। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ মানসিক। মনে কর, কেউ তোমার মনে কষ্ট দিলে, আর তারপর তোমাকে সুখাদ্য খেতে দিলে, সুপেয় পান করতে দিলে, তুমি খেতে চাইবে না। তোমাকে প্রহার করলে তুমি অন্তরে যতটা ব্যথা পাৰে, তোমার

প্রতি নিন্দা বা কটূক্তি করলে তুমি তার চেয়ে বেশী ব্যথা পাবে, কারণ তুমি মনপ্রধান জীব। এই মন-প্রধান জীব ইত্যর্থেই 'মনু' শব্দটা এসেছে। আর 'মনু'-র থেকে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করে 'মানব' শব্দটা এসেছে। মানব মানে সেই জীব যার মধ্যে মনের ভূমিকা প্রধান। এখন মনের অনেক কাজ রয়েছে, যেমন চিন্তা করা, যেমন স্মরণ রাখা। এগুলো তো মন করছেই, তদতিরিক্ত, মন যখন এগিয়ে চলে, তখন তিন ধরণের পথ ধরে এগিয়ে চলে। এক ধরণের পথ হ'ল বিচার-বিবেকের পথ। এই যে বিবেকের পথ-এই বিবেকের পথটা কেমন! এটা করা উচিত, না এটা করা উচিত নয়; উচিত—না উচিত নয়; উচিত কি অনুচিত-এইভাবে বিচার করতে করতে, ডিক্রিমিনেট্ করতে করতে, এই সদসদ বিচারবুদ্ধির পথে চলতে চলতে মানুষ যখন ঔচিত্যের পথটাকে বেছে নেয় সেটাকে বলা হয় 'বিবেক' (conscience) আর এই উচিত অনুচিত—এই যে বিচারটা এটা হ'ল 'লজিক'। এগিয়ে চলা যেখানে হয় বিবেকের দ্বারা, কনসাইন্স এর দ্বারা, সেখানে সেই চলার পথটায় আছে কাছাকাছি দুটো জিনিস- ঔচিত্য ও অনৌচিত্য, করণীয় ও অকরণীয়, চর্য ও অচর্য। এতেও গতি আছে। তবে এর গতিটা দ্রুত

হতে পারে–অতি দ্রুত নয়। তার কারণ, একবার ঔচিত্যকে দেখৰ মনে মনে, আরেকবার অনৌচিত্যকে দেখৰ–দেখতে দেখতে সিদ্ধান্তে (decision) পৌঁছুৰ। তারপর যে সিদ্ধান্তটা হ'ল– সেটাই হ'ল বিবেক (conscience)। সুতরাং এটাকে একবার দেখছি, ওটাকে একবার দেখছি, এইভাবে ভাবতে ভাবতে পা ফেলছি, তাই ডৰল মার্চ করে যাওয়া একটু অসুবিধাজনক হয়। এতে গতি থাকে কিন্তু দ্রুতির মাত্রাটা তুলনামূলক বিচারে কম হয়। আর মনের দ্বিতীয় অগ্রগতি হচ্ছে ....সেন্টিমেন্টাল। উচিত–অনুচিত বিচার করছি না, পছন্দ হয়ে গেল, তাই মনটাকে তার পেছনে ছুটিয়ে দিলুম। মনটাকে যে ছুটিয়ে দিলুম, হতে পারে তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অনৌচিত্য অর্থাৎ অবাঞ্ছনীয় কাজ করলুম। আবার এমনও হতে পারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ঔচিত্য অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় কাজ করলুম। কিন্তু তা বড্ড বেশী ঝুঁকির জিনিস (risky)। অর্থাৎ গোড়াতে, মধ্যে, শেষে অনৌচিত্য যদি থাকে, তাহলে যে শুধু ব্যষ্টিবিশেষ ধ্বংস হবে তা নয়, সে একটা গোটা পরিবার, গোটা জনগোষ্ঠী, গোটা রাষ্ট্র, গোটা সমাজকেও অন্ধকূপে ফেলে দিতে পারে। মহা বিপদ! এই যে ঔচিত্যের–অনৌচিত্যের বিচার না

করে ছুটে চলা–এইটাই হ'ল সেন্টিমেন্ট, বাংলায় ৰলে 'ভাবপ্রবণতা'। অর্থাৎ যে ভাবটি মনে এসেছে তার ভাল মন্দ ভাবলুম না। সোজা ছুটে গেলুম, ৰল্গাবিহীন ঘোটকের মত। সে গভীর খাদেও পড়ে যেতে পারে, আবার ঠিক রাস্তাতেও চলে যেতে পারে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখন, মানুষের মধ্যে ঔচিত্য– অনৌচিত্য বিচারের ক্ষমতাটা আছে, কারণ মন একটু উন্নত কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের মন উন্নত নয়। মন উন্নত নয় ৰলেই তার পক্ষে লজিকের পথে, সদসদ্ বিচারবুদ্ধির পথে চলা সম্ভব নয়, যা অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যারা ৰলে, পড়াশোণার দরকার নেই, বইপত্তর শিকেয় তুলে রাখ, তাদের এ ধরণের কথাটা কিন্তু খুৰ ঠিক হচ্ছে না। পড়াশোণার দরকার আছে, জানা–না–জানার দরকার আছে, বিদ্বান–পণ্ডিত মানুষের সংস্পর্শে আসার দরকার আছে, ভালো জিনিস শোণার প্রয়োজন আছে, স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন আছে, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের সে সামর্থ্য নেই। লজিকের পথে তারা চলতে পারে না, বিবেকের পথে তারা চলতে পারে না। তাদের মধ্যে যারা উন্নত তারা সেন্টিমেন্টের পথ ধরে চলে। ভাল লেগে গেল তো ছুটে গেলুম, ভাল লাগল না তো গেলুম না। মনে হচ্ছে, এক

টুকরো রুটি পড়ে রয়েছে, কুকুর দৌড়ে সেদিকে চলে গেল, এদিক ওদিক করল না। পাখী ব্যাধের জালে ধরা পড়ে। আরে! তলায় তো ধান ছিটোন রয়েছে! ব্যাস, নেৰে পড়ি। নেৰে পড়ল–জালে ধরা পড়ল। আর যদি লজিকের পথে যেত–তাহলে ভাবত–আচ্ছা, এই রকম বনভূমির মধ্যে ধান ছড়ানো আছে! এ তো হতে পারে না। কাছে গ্রামও নেই, ধানের ক্ষেতও নেই! সুতরাং কিছু গোলমেলে ব্যাপার! দেখ তো বিচার করে। আরে! চারপাশে তো জাল বিছানো রয়েছে, দড়াদড়ি ছড়ানো রয়েছে। এখানে নাবিস্ নে–এটা লজিকের পথ। আর সেন্টিমেন্টটুকুও নেই। তাদের মধ্যে আছে সহজাত বৃত্তি (inborn instinct)। জন্মসূত্রে যে মানসভূমিটা তারা পেয়েছে ততটুকু নিয়েই তারা চলে। অক্টোপাস এই মানসভূমির দ্বারাই কাঁকড়াকে ধরে। মশা এই ইবর্ণ ইন্সটিংই–এর দ্বারাই অন্যের গায়ে বসেই রক্ত শুষে নেয়। এতে তার দোষ–গুণ বিচার, সেন্টিমেন্ট কিছুই নেই। এগুলোর সে অধিকারীই নয়। তা ইনৰর্ণ ইন্সটিংক্টকে ছাপিয়ে ওঠে সেন্টিমেন্ট পরিণত জীবের ক্ষেত্রে। আরও উন্নত হলে, যেমন মানুষের সেন্টিমেন্ট রয়েছে, তার সঙ্গে লজিক রয়েছে, বিচারবুদ্ধি রয়েছে। কেউ যদি যুক্তির পথ

ত্যাগ করে সেন্টিমেন্টের পথ ধরে তাহলে তাতে যে বিপদের সম্ভাবনা ষোল আনা রয়েছে এ কথা তো ঠিকই। অধিকন্তু আর একটা বড় বিপদ দেখা দেয়। সেন্টিমেন্টের পথে চলৰার সময়ে উচিত-অনুচিত ভাবে না। সেই সময়টা হয় কী?-না, যে লক্ষ্যে চলেছে সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যত সব সুপারষ্টিশ্যান থাকে, অন্ধবিশ্বাস থাকে সেগুলোকে মুখ বুজে মানুষ মেনে নেয়। কোন রকম ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্নও জাগে না, কারণ সে সেন্টিমেন্টের পথ ধরে চলেছে। এখানে দরকারটা কী?-না, মানুষ যুক্তির পথ ধরে চলুক। যুক্তিটা মানুষের একটা সম্পদ, আর এটা একটা মানবিক সম্পদ যা আর কোন জীবের নেই; আর যে মানুষের ভেতরে রয়েছে ভাবসম্পদ অর্থাৎ ভক্তি, বাইরের জগতে রয়েছে যুক্তি, সেই মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী। সে-ই পৃথিবীতে কাজের কাজ করে যায়। যে সেন্টিমেন্টে ভেসে যায় সে সাময়িক ভাবে লোকের ৰাহৰা কুড়োয়, হাততালি কুড়োয়। শেষ পর্যন্ত, মানে পরবর্তীকালে লোকে বুঝে নেয়-না, এ তো ভুল করেছিল, এ তো যুক্তির পথ মাড়ায় নি, এ তো সেন্টিমেন্টের স্রোতে নিজে ভেসেছিল, সমাজকেও ভাসিয়ে দিয়েছিল—যার ফলে সমাজ ধ্বংস

হয়ে গেছে। মানুষ তার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে শুরু করে। তাই এককালে যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজসিংহাসন পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের সিংহাসন গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়। ইতিহাসের এইটাই শিক্ষা। এককালে যাকে মাথায় নিয়ে লোকে নেচেছে, আদিখ্যেতা করেছে, সিংহাসনে বসিয়েছে, পরবর্তীকালে তারাই হাত ধরে টেনে ধুলোয় নাৰিয়ে দিয়েছে তাকে। বলেছে-তোর দিন ফুরিয়ে গেছে, তুই অনেক ক্ষতি করেছিস। আর যে লজিকের পথে চলে, সে বড় কাজও করতে পারে, মাঝারি কাজও করতে পারে, হয় তো বা বলার মত এমন কিছুই করতে পারে না, কিন্তু তার দ্বারা সমাজের ক্ষতি হয় না। সেই জন্যে তারা যেটুকু সম্মান বা যত বেশী সম্মান পেয়ে থাকুক না কেন, সেটা তার অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, কারণ মানব সমাজের সে ক্ষতি করেনি।

এখন যে জিও-সেন্টিমেন্ট মানুষের ভাব-সম্পদের ওপর প্রথম আঘাত হানে, সেই জিও-সেন্টিমেন্টটা কী?- না, একটা বিশেষ ভূ-খণ্ডকে কেন্দ্র করে তার সেন্টিমেন্টকে, ভাবপ্রবণতাকে ছুটিয়ে দেওয়া। সে তার

চোখ কাণ মেলে দেখে না যে আমি যা করছি তা উচিত কি অনুচিত, তা যুক্তিনিষ্ঠ কি অযৌক্তিক। এই পরিস্থিতিতে ভাবপ্রবণতা যুক্তিবিজ্ঞানের স্থানচ্যুতি ঘটায় মানে পরবর্তী ধাপে কুসংস্কার যুক্তিবিজ্ঞানের স্থানচ্যুতি ঘটায়। (logic is substituted by superstition)। তাই যে সমস্ত রেলিজন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি জিও-সেন্টিমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কী করে?-না, অন্ধবিশ্বাসের কাছে মাথা বিকিয়ে দেয়। তথাকথিত যে সমস্ত রেলিজন মুখে বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু তলে তলে জিও-সেন্টিমেন্টর দ্বারা সম্প্রেষিত হয়, তারা কী করে! না, তারা অন্ধবিশ্বাসের খনিতে পরিণত হয়, অন্ধবিশ্বাসের মহাসাগরে পরিণত হয়, তারা অন্ধ-বিশ্বাসের মহাপঙ্কে মানুষকে নিমজ্জিত করে। আর যুগ যুগ ধরে মানুষ সেই পাঁকে হাৰুডুবু খায়। তার অগ্রগতি চিরতরে শেষ হয়ে যায়। আগে বলেছি যে রেলিজনের ক্ষেত্রের চেয়েও সমাজের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকেন্দ্রিক বা ভৌগোলিক অবস্থানকেন্দ্রিক সেন্টিমেন্ট নিয়ে যেখানে চলেছে, সেখানে অন্যের কথা মানুষ ভাবে না। অন্যের প্রাণরস শোষণ করে নিজেকে পুষ্ট করার চেষ্টা করে।

আর ভাবে এটাই তো স্বাভাবিক। সেদিন ৰলেছিলুম, এই ধরণের মনোবৃত্তি থেকেই বৈবহারিক জগতে 'ফ্যাসিজম্'-এর জন্ম হয়। এই থেকে বৈবহারিক জগতে 'ইম্পেরিয়ালিজম্'-এর জন্ম হয়। এই মনোবৃত্তি থেকে বৈবহারিক জগতে 'ক্যাপিট্যালিজম্'-এর জন্ম হয়। এই মনোবৃত্তি থেকেই 'ওলিগার্কি' ও 'ব্যুরোক্র্যাসি-র' জন্ম হয়। তাহলে বুঝছ এই মনোবৃত্তিটা কত সাংঘাতিক ও মানব প্রগতির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর! এই তো হ'ল সমাজ জীবন।

অর্থনৈতিক জীবনেও তাই। যদিও আমার এলাকায় কাঁচা লোহা নেই, যদিও আমার এলাকার সস্তা বিদ্যুৎশক্তি নেই, তবুও আমার এলাকায় ষ্টীল প্ল্যান্ট খুলতে হবে-এই হ'ল জিও-ইকনমিক সেন্টিমেন্ট। যদিও আমার এলাকায় কাঁচা খনিজ তেল নেই, যদিও এলাকায় সস্তা বিদ্যুৎ নেই, তবুও আমার এলাকায় তৈল শোধনাগার করতে হবে। এই হ'ল জিও-ইকনমিক সেন্টিমেন্ট। একটা তাজা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সেকালের ৰাঙলার কাঁচা পাটে ডান্ডির পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল, আবার সেই শিল্পজাত তৈরী মাল ৰাঙলার ৰাজারে বিক্রী

হত। এ জিনিসটা কেমন ছিল?–না, বাঙলার ক্ষেত্রে এটা ছিল সুযোগ–সামর্থ্যের অব্যবহার, আর ডাণ্ডির পক্ষে এটা ছিল স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনাপূর্ণ একটি অবিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প। যদি ৰাঙলা থেকে কাঁচা পাট না পাওয়া যেত, ডাণ্ডির কারখানা চলত না। যদি ৰাঙলার ৰাজারে পাটের তৈরী পণ্যের বিক্রী না হত, তাহলে ডাণ্ডির কারখানা রুগ্ন শিল্পে পরিণত হত। এই ধরণের অবস্থায় কাঁচা মালের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অথবা তৈরী শিল্পজ পণ্যের বাজার পাওয়ার জন্যে শিল্পোন্নত দেশগুলি ইম্পেরিয়্যালিজম্, ইকনমিক্ ফ্যাসিজম, পলিটিক্যাল ফ্যাসিজম্, সোসিও–ইকনমিক পলিটিক্যাল রিফরমিজম্–এর পথ ধরে। কাঁচা মাল পাবার জন্যে ও তৈরী মালের বাজার পাবার জন্যে তারা তাদের চার পাশে একটা উপগ্রহ–বৃত্ত (satellite arena) তৈরী করতে চায়। উন্নত দেশগুলির এই মনোবৃত্তি উন্নতিশীল বা অনুন্নত দেশগুলি যখন ধরে ফেলে তখন উন্নত দেশগুলির সঙ্গে উন্নতিশীল বা অনুন্নত দেশগুলির সংঘর্ষ দেখা দেয়, বিশ্বশান্তির ওপর হাতুড়ির আঘাত পড়ে।

বর্তমান ৰাঙলার সমস্ত পাটকলগুলি ৰাঙলার পাটে পুষ্ট নয়। বহির্ভারত থেকেও এজন্যে কাঁচা পাট কেনার দরকার হয়। পাট শিল্পকে যদি স্বাস্থ্যসম্মত করতে হয়, তাহলে লজিকের পথে চলতে হবে–জিও– সেন্টিমেন্টের পথে নয়। বাঙলার কাঁচা পাটে যতগুলি পাটকল চলতে পারে ততগুলি চলতে দিয়ে ৰাকীগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। যেগুলি চলবে সেগুলিতেও পাটজাত পণ্য তৈরী না করে পাটের বিভিন্ন মানের সূতো তৈরী করতে হবে। এই সূতোগুলি পাটশিল্প সমবায়ের মাধ্যমে চাষী ও তন্তুবায়দের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এই পাটশিল্প সমবায় কেবল সেই সকল পণ্যের উৎপাদন করবে যাদের বাঙলায় চাহিদা আছে, কিছু পরিমাণে বাঙলার বাইরেও আছে। এখন বৈবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, বাঙলায় তন্তুজ পণ্যের বিরাট অভাব রয়েছে। শিল্প সমবায়গুলিতে উৎপন্ন পণ্যও সেই তন্তুজ পণ্যের অভাব দূর করবে। শিল্প বিকেন্দ্রীকৃত হওয়ায় টাকা জনগণের হাতে ছড়িয়ে পড়ৰে। আরও ভাল হয় যদি এ পাটের সূতোও বড় বড় পাটকলগুলিতে উৎপাদন না করে বাঙলার ছোট ছোট শহরগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়।

যাই হোক্, এবার আসল কথায় আসা যাক্। সমাজ জীবনে তো এই জিও-ইকনমিক সেন্টিমেন্ট ক্ষতি করে বলেইছি, এ হ'ল ইকনমিক লাইফ্। এখানেও একই ব্যাপার-লজিকের বালাই নেই। লজিক হ'ল কেবল মানবিক গুণ, অন্য পশুর এই গুণ নেই। এই রকমই জিও-রেলিজন। অমুক দেশে অমুক পুণ্য তীর্থ আছে, অনুক তীর্থে মরলে কাকও বৈকুন্ঠে চলে যায়, মানুষ তো দূরের কথা। আদিখ্যেতা দেখাতে গিয়ে কেউ বললে যে আমি বৃন্দাবনের দাস। জিও-সেন্টিমেন্টের একটা চরম। বৃন্দাবন একটা মাটি-তুই তার দাস কী করে হৰি রে বাবা! সব বৃদ্ধিবৃত্তি খুইয়ে বসে তবে না বলছেন কথাটা। আরেকজন বললেন-দাস নয়, দাস নয়, বৃন্দাবনের ব্রজরজ। আরে। তুই মানুষ, পঞ্চভূতে তৈরী, তুই ধূলো হতে যাবি কোন দুঃখে? আরেকজন আরও একটু এগিয়ে বললেন-না, ধুলো নয়, ধুলো নয়, বৃন্দাবনের কাকবিষ্ঠা। আদিখ্যেতার চরম। এরা দিব্যি বুদ্ধিবৃত্তি খুইয়ে বসেছে। লজিকের বালাই নেই। একে বলৰ জিও-রেলিজন্। মরতে হয় তো কাশীতে গিয়েই মরৰ। আরে বাবা। সব দেশই সমান। সব দেশই তো পরমপুরুষের সৃষ্টি। অর্থাৎ

বিশ্বানুস্যূত যে ধর্মভাব-ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যপ্ত ("বিস্তার সর্বভূতস্য বিষ্ণোবিশ্বমিদং জগৎ") এই ধর্মের মূল সুরটি হারিয়ে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত কাশীকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম দাঁড়িয়েছে-জিও-রেলিজন। কোন একটা তীর্থে জীবনে অন্ততঃ একবার যাও, তাহলে বেহেস্তের বাংলোটি রিজার্ভ থাকবে। এ কেমন মনোবৃত্তি! সব দেশই সমান। কেবল পূর্বদিকে তাকিয়ে পুজো-এ আবার কেমন ব্যাপার গো। সব দেশই, সব দিকই তো সমান।

"এসোহজাত প্রদিশোহনু সর্বা।
পূর্বোহজাত সউ গর্ভে অন্তঃ।।"

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ্ব, অধঃ- সব দিক নিয়েই আমার পরম ব্রহ্ম, আমার পরম পুরুষ। কোন একটা দিক নিয়ে আদিখ্যেতা করতে যাচ্ছি। তার মানে জিও-রেলিজন; ধর্ম নয়-উপধর্ম। এখন এর ফলটা কী হয়। এই যে জিও-রেলিজন, জিও-

ইকনমিক্স, সোসিওলজি, সোসালিজম্, সোস্যাল সেন্টিমেন্ট– এগুলোর ফল হয় এই যে 'জিও'-গুলো একটা বিশেষ দেশে, বিশেষ দিকে সীমিত হয়ে রয়েছে। আর যে দেশটায় নেই বা যে দিকটায় নেই সেগুলো হয়ে যাচ্ছে অপবিত্র– 'না–পাক্', আর সেই অপবিত্রতার ভিত্তিতে যাদের জিও–সেন্টিমেন্ট–এ পূর্ব দিকটা পবিত্র, আবার যার জিও–সেন্টিমেন্টে পশ্চিম দিকটা পবিত্র...তাদের সেন্টিমেন্টে সেন্টিমেন্টে সংঘর্ষ ৰাধছে, মানুষে মানুষে লড়াই করে মরছে, আর মানবত্বের সুরটিকে ভুলে যাচ্ছে। ধর্মের মূল নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তা'হলে আমরা এখানে দেখছি, মানুষের ভাবসম্পদের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে কী? না, জিও–সেন্টিমেন্ট। এই জিও–সেন্টিমেন্ট কোথায় আসছে, জন্মাচ্ছে?-না, যেখানে মানুষ লজিক্যাল এ্যাপ্রোচ নিচ্ছে না, যেখানে মানুষ বিবেকের পথে চলছে না। ধর্ম বিবেকের পথের চরম লক্ষ্য–ধর্ম জিও–সেন্টিমেন্টের জিনিস নয়, জিও–সেন্টিমেন্ট অত্যন্ত সস্তা জিনিস। এই সস্তা জিনিসের বিনিময়ে পরম পুরুষকে পাওয়া যায় না। বৃহতের বিনিময়ে বৃহৎকে পেতে হয়। খুৰ দামী জিনিস কিনতে গেলে খুৰ বেশী

পয়সা দিতে হয়। পরম পুরুষ অত সস্তা নন। জিও-সেন্টিমেন্টে পরম পুরুষকে পাওয়া যায় না। তেমনি জিও-সোস্যালিজম্, জিও- পলিটিক্স্.....অনেকে ন্যাশন্যাল সোস্যালিজম্-ও করে, অর্থাৎ সোস্যালিজটা আমার দেশের মধ্যেই সীমিত-তা হয় না। জিও- সেন্টিমেন্ট আশ্রিত জিও-সোস্যালিজম, জিও-রেলিজন, জিও-ইকনমিক্স- এরা যে মানুষকে সীমিতত্বের বন্ধনে বদ্ধ করে' রাখে তাই নয়, অধিকন্তু একটা জনগোষ্ঠীকে ক্রমশঃ অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর শুধু তাও নয়, একটা জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতি মারমুখী ক'রে তোলে যা মানব সভ্যতার পক্ষে চরম বিপজ্জনক।

(কলকাতা, ৭ই মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

ভাবসম্পদ

নব্যমানবতাবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলুম ভৌম ভাবপ্রবণতাকে প্রতিহত করতে গেলে দরকার হচ্ছে বিচারপ্রবণ মানসিকতা ও ষ্টাডি আর সামাজিক ভাবাবেগকে প্রতিহত করতে গেলে দরকার হচ্ছে প্রোটো-স্পিরিচুয়ালিষ্টিক সাইকিক স্ট্রাকচারের। কিন্তু এই যে জিও-সেন্টিমেন্ট ও সোসিও-সেন্টিমেন্ট-এদের প্রতিকার সম্পূর্ণতই বিষয়গত জগতের জন্যে। কেননা ভৌম ভাবপ্রবণতা বা জিও-সেন্টিমেন্ট একান্তভাবেই দেশের সীমায় সীমায়িত, অন্য দিকে সামাজিক ভাবপ্রবণতা বা সোসিও- সেন্টিমেন্টও বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ বা পাত্রগত। এই দেশগত ও পাত্রগত ভাবপ্রবণতাকে যথাক্রমে যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ও সম-সমাজ- তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিহত করতে করতে অন্তর্লোকে পরাগতির দিকে এগোনো সম্ভব হবে। সুতরাং এ সম্পূর্ণতই বাইরের জগতের।

মানুষের অন্তর্জগতের যে চলমানতা তা একান্ত ভাবেই ভেতরকার ব্যাপার অর্থাৎ ভক্তির ব্যাপার বা কাল্ট হিসেবে, মিশন হিসেবে অন্তর্লোকে এগিয়ে চলার পথ। রেশানালিষ্টিক জগতে মানুষ ভেতরকার কিছুই পায় না

আর ভক্তির জগতে কোন 'ইজ়ম্' নেই যা মানুষকে স্ব-স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। সেক্ষেত্রে মানুষই স্বমহিমায় স্বরাট; এটা সম্পূর্ণ ভাবলোকের জিনিস। সেক্ষেত্রে আছে ভক্তিমার্গ, ডিবোশান্যাল স্পিরিট, ভক্তিমধুর ব্রত। লক্ষ্য সেখানে পরমপুরুষ আর আমি। এখানে কেউই ৰাধা দিতে আসবে না, কেউ শোষণ করতে আসবে না, কোন জিও-সেন্টিমেন্ট নেই, কোন সোসিও-সেন্টিমেন্ট নেই। সেখানে মানুষই একমেবাদ্বিতীয়ম্। এ অবস্থায় মানুষ পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে যায়-প্রতিটি পদবিক্ষেপে। এসব রেশানালিষ্টিক এ্যাপ্রোচ ও ষ্টাডির ঊর্ধ্বে ও এখানে বিষয়গত মনের (অর্জেক্টিভ মাইণ্ড) কোন কারবার নেই। তবে অন্তর্জগতে চলার সময় বাইরের জগতের রেশানালিষ্টিক আউটলুককে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তারও প্রয়োজন আছে কেননা তা নাহলে অন্তর্জগতের ভাবনা ব্যাহত হতে পারে। তবে এও ঠিক যে মন একান্তভাবেই পরমপুরুষের দিকে চালিয়ে দিতে হবে কেননা অন্তরের ভাবসম্পদের প্রত্যক্ষ পুষ্টি হচ্ছে পরমপুরুষের কথা ভেবে-তার দিকে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়াতে। এই এগিয়ে যেতে যাতে অসুবিধা না

হয় কেবল সেটুকুর জন্যেই র্যাশান্যালিস্টিক আউটলুক ও ষ্টাডির দরকার।

"রাজা হতে চাই না গো মা
সাধ নাই গো মা রাজা হতে,
আমার মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা
পাই যেন তায় খড় যোগাতে।"

রামপ্রসাদ

এই যে বৃহতের আকর্ষণ-দুর্বার আহ্বান, এতে সাড়া দেবার জন্যে তৈরী থাকাই খাঁটি মানুষের কাজ। এই যে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা যা মহাপ্রভু ৰাঙলায় সাড়ে পাঁচ শ' বছর আগে নিয়ে এসেছিলেন তার বাইরের দিকও রয়েছে, ভেতরের দিকও রয়েছে। মহাপ্রভু এই দোলযাত্রা উৎসবকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসেন। তবে মহাপ্রভু ৰাইরের দোলযাত্রাকে আধ্যাত্মিক ভারনায় মণ্ডিত করে নাম দেন "শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।”

এখন, মানুষ যখন পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে চলছে, তখন ছুটে চলতে চলতে তার মনে ক্ষণিকের জন্যে এই ভাবনা এলেও ঞ পারে যে আমি তো অনেক পাপ করেছি, আমি পাপী, আমি যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপোপহত....। এই যে রঙ এই যে পাপের রকমারি রঙ এই যে পাপের বর্ণাঢ্য সামবেশ তা তার মনে রেখাপাত করতে পারে। তার ফলে তার চলার দ্রুতি কিছুটা কমে যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার ভেতরের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার মনের এই সব রঙ তোমাকে দিয়ে আমি কর্ণহীন হলুম। এটা মানুষকে পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেষণা দেয়। তাই রঙ খেলা বাইরের রঙ খেলা নয় এটা সম্পূর্ণতই মানসাধ্যাত্মিক ব্যাপার। আনন্দমার্গের বর্ণার্ঘ্য দানের পেছনে এই সাইকো- স্পিরিচুয়াল ফেনোমেনানই কাজ করছে...কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ হে পরমপুরুষ আমায় বর্ণহীন করে দাও যাতে আমি অকুণ্ঠভাবে তোমার দিকে ছুটে যেতে পারি। মানুষ যতই নব্যমানবতাবাদে প্রতিষ্ঠিত হবে ততই সে আর বাইরের রঙে মেতে থাকবে না, ভেতরের মনের রঙে বিভোর হয়ে থাকবে। অবশ্য বাইরের রঙ খেলায় যে সামাজিক

মেলামেশা ও সামাজিক আনন্দের ব্যাপার রয়েছে তা যে একেবারেই করবে না তা নয়। তবে সামাজিক অনুষ্ঠান মানলেও তাকেই সর্বস্ব বলে মেনে নিলে চলবে না, বরঞ্চ পরমপুরুষকে অর্ঘ্য দিয়ে বাইরের রঙ ভুলে গিয়ে তাকে ভেতরের রঙে নিবিড় হয়ে থাকতে হবে। এই যে অন্তর্জগতের নিবিড়তা এটাই হচ্ছে মানস জগতের বৃন্দাবন অর্থাৎ নিষ্কল মানস–যে মনে দাগ লাগেনি। পৃথিবীতে চলতে গেলে ধুলো লাগতে পারে আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। কর্ণার্য্য দানের মধ্যে দিয়ে হতে হবে নিষ্কলমানস। বাইরের রঙ খেলাকে ভুলতে ভুলতে ভেতরের রঙ খেলাকেই জীবনসর্বস্ব করে নিতে হবে–প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজেকে তার চরম বৃন্দাবনে।

(দোলপূর্ণিমা, কলকাতা, ৯ই মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

জৈব সত্তা ও মানসিকতা

প্রাকৃতিক নিয়মে জীবজগৎ দু'ভাগে বিভক্ত-একটা যূথবদ্ধ, আরেকটা একক। এখন দেখা যাক এদের ধরণ-ধারণ কেমনটি। যখন মন কাজ করছে.....চিত্ত কর্মায়িত অবস্থায় রয়েছে তখন এককৌষিক জীব বুঝে নিতে পারে যে এটা আমার খাদ্য, এটা আমার খাদ্য নয়; এটা আমার নির্ধারিত নিদ্রাকাল, এটা নিদ্রাকাল নয়। এই যে জীবিত সংরচনার সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা (minimum essentialities of a living structure), কেবল এ সম্বন্ধীয় ৰোধটুকুই থাকে এককৌষিক জীবের মধ্যে। এখন এ জিনিসটা এককৌষিক অণুজীবেতে (unicelluler creature) যেমন বহুকৌষিক অণুজীবেতেও (multicelluler creature) প্রায় তেমনই। তবে তফাতের মধ্যে এই যে জীবিত সংরচনার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা যা সেটা অক্ষমভাবে পরিচালিত হয় এককৌষিক অণুজীবের ক্ষেত্রে ও সক্ষমভাবে হয় বহুকৌষিক অণুজীবের ক্ষেত্রে। আর যেহেতু মাল্টিসেলুলারের ক্ষেত্রে অনেকের সমষ্টিতে এক হচ্ছে তাই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সমিতি (clash and cohesion) ঘটছে আর এই সংঘর্ষ ও সমিতির ফলে অবনত মন (lower mind) চূর্ণবিচূর্ণ (powder down) হয়ে সূক্ষ্মতর মনে (subtle mind) রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা কী পাই?-না, এই অবস্থাতে সেই যে বহুকৌষিক সংরচনাটা সে অনুভব করে যে তার মধ্যে একটা

আবেগের প্রয়োজন, একটা মোমেন্টামের প্রয়োজন। এই সংবেগটা (momentum) স্থলতর স্তরে তো থাকেই, সূক্ষ্মতর স্তরেও (subtler layer) নিষিক্ত হয়। আর এই যে সূক্ষ্মতর স্তরে চলে যাওয়া, এই যে জড় সংবেগের সূক্ষ্মতর সংবেগে অভিবর্তন (switch-over of this physical momentum into subtler momentum) এইটাই হচ্ছে মানুষের-জীবের সেন্টিমেন্ট; মানুষের ৰলৰ না, ৰলৰ জীবের সেন্টিমেন্ট।

এখন, এই সেন্টিমেন্ট দ্বি-ধারায় প্রধাবিত হয়। একটা ধারা ভাবে, এই যে সেন্টিমেন্ট রয়েছে জীবের (জীব মানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনুষ্যেতর জীবের) এই সেন্টিমেন্টের ৰলেই "আমি স্বমহিমায়, স্বদর্পে স্বরাট....আমি এর ৰলেই প্রতিষ্ঠিত হব"। আর তার ফলে তারা যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। তারা এককভাবে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে। এমনকি তাদের পারিবারিক জীবনও থাকে না। বাঘ, কুকুর ও এই ধরণের অনেক জীবই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ (extremely sentimental)। সেন্টিমেন্টের ওই ধারা একক বুদ্ধিধারায় চলে। তাই তাদের পারিবারিক জীবনও নেই। আবার আরেকটা শাখা তৈরী হয় যে শাখা ভাবে আমার একক বুদ্ধি, আরেক জনের একক বুদ্ধি, আরেক জনের একক ৰুদ্ধি, এই রকম বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ জনের একক বুদ্ধি যদি মিলিত হয়

তাহলে আমরা শরীরে শক্তিমান তো আছি-ই, বুদ্ধিতেও শক্তিমান হৰ। তারা যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। সিংহ, হাতী, পায়রা-এরা সৰ যূথবদ্ধ জীব। এদের পরিবার আছে- পারিবারিক জীবনও আছে। এইভাবে এগিয়ে চলে। এখন এই যে যূথবদ্ধতা অথবা একক জীবিত-এটা যে সর্বক্ষেত্রেই ৰুদ্ধির মানের ওপর নির্ভর করে তা নয়। যেমন ভেড়ার বুদ্ধি খুবই কম কিন্তু যে যূথবদ্ধ জীব। আবার হাতীর বুদ্ধি বেশী-সেও যূথবদ্ধ। সিংহের বুদ্ধি কম-সে যূথবদ্ধ।

এই যে জীবের দুটো ধারা, এই দুটো ধারার যদি বিন্যস্ততা বিচার করে দেখি তাহলে মানুষ হ'ল যূথবদ্ধ গ্রুপের জীব। এখন যূথবদ্ধতা নির্ভর করে মানসিক সংরচনার ওপরে। অর্থাৎ কোন্ লাইনে ও কে কোন পংক্তিতে ভেবে চলেছে তার ওপর। অর্থাৎ কারা ভেবে চলেছে যে দল বেঁধে থাকলেই আমাদের লাভ আর কারা ভেবে চলেছে-না, একক ভাবেই আমাদের অভিস্ফূরণ বেশী হবে-এই চিন্তার ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ ভাবত এটা দাঁতের বিন্যস্ততার ওপর অর্থাৎ দাঁতের সাজাবার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। যাদের ক্যানাইন টিথ্ তাদের একটা বিশেষ ধরণ, যাদের নন-ক্যাননাইন টিথ্ তাদের আর এক ধরণ; কিন্তু এ ধরণের বিচার একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ যাদের ক্যানাইন

টিথ্ আছে তাদের মধ্যেও কেউ যূথৰদ্ধ, কেউ যূথবদ্ধ নয়। সিংহের ক্যানাইন টিথ্ থাকা সত্ত্বেও সে যূথবদ্ধ, বেড়ালের ক্যানাইন টিথ্ আছে কিন্তু সে যূথৰদ্ধ নয়।। এটা মানসিকতার ওপরেই নির্ভর করে অর্থাৎ এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণীজগতের অগ্রগতি কেবল দাঁত, নখ, থাৰার ওপরেই নির্ভর করে না-নির্ভর করে তার মানসিক সংরচনার ওপরে।

এখন মানুষ যদিও যূথবদ্ধ জীব, কিন্তু যূথবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বৌদ্ধিক স্তর অন্যান্য জীবের চেয়ে বেশ উঁচুতে। আর বেশ উঁচুতে হওয়ার ফলে অন্যান্য জীবের যে সহজাত বৃত্তি সেটা তো মানুষের আছেই-সৰ জীবেরই আছে। অন্যান্য জীবের যে রকম সেন্টিমেন্টালিজ়ম্ বা সেন্টিমেন্টালিটি সেটাও অন্যান্য জীবের মত মানুষেরও আছে। কোন মানুষের বেশী, কোন মানুষের কম। আর সব চেয়ে বেশী মানবিক সম্পদ মানুষের রয়েছে-একটা লজিক্যাল মন যা আর কারো নেই। এখন হয় কি, সেন্টিমেন্টালাইজড় যে যূথবদ্ধ জীবন–জড়ায়িত জীবন (groupified life), গ্রুপিজম, অর্ধ-সম সামাজিক মানসিকতা-(demi- social mentality-ডেমি সোস্যাল মেন্টালিটি ৰলতে বোঝায় যেখানে সমাজ চেতনা আছে, কিন্তু তা খণ্ডতর মানসিকতার বিরুদ্ধে যুঝতে সক্ষম নয়) এগুলো মানুষের মধ্যে

জেগে ওঠে কারণ মানুষের সেন্টিমেন্টালিটি তো আছেই অন্য জীবের মত, আবার যেহেতু তার লজিক্যাল মেন্টালিটিটাও রয়েছে, বিচারপ্রবণ মানসিকতাও রয়েছে তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একই মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একই মানুষের মধ্যে কখনও রেশানালিষ্টিক মেন্টালিটি জয়ী হয়ে ওঠে, আবার কখনও সেন্টিমেন্টালিটি জয়ী হয়ে ওঠে। সহজাত বৃত্তি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে থাকে। একটা শিশু, তাকে কেউ শেখায় না যে তাকে কাঁদতে হাসতে হবে। ওগুলো সহজাত বৃত্তি থেকেই পেয়ে যায়। অবনত জীবগুলো ওই সহজাত বৃত্তিকেই পুঁজি করে বেঁচে থাকে,-উন্নত জীবগুলো তা নয়। তাদের সেন্টিমেন্টালিটি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজাত বৃত্তি কিছুটা ঢাকা পড়ে যায়। আর মানুষের লজিক্যাল মাইণ্ড আসার সঙ্গে সঙ্গে সেন্টিমেন্টালিটিটাও কমতে থাকে।

এখন এই সেন্টিমেন্টাল ষ্টেজের ভেতরেই জীবজগতে দু'টো বিভাজন হয়ে যায়-একটা যূথবদ্ধ, আরেকটা এককজীবী। মানুষ সেন্টিমেন্টালিটির এক্তিয়ারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার যূথবদ্ধতা ঠিক থাকে, কিন্তু সেই যূথবদ্ধতা, সেই জড়ায়িত জীবন, সেই অর্ধ-সমসামাজিক মানসিকতা ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয় (That groupism, that group- feeling, that

demi-social mentality is goaded by sentimen- tality.)। কিন্তু যখন লজিক বিকশিত হয়ে যায়, সেন্টিমেন্টালিটির পরিধি তখন ছোট হতে থাকে, সেন্টিমেন্টালিটি সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। যতক্ষণ গ্রুপিজম ভাল আছে ততক্ষণ সেন্টিমেন্টালিটিও ভাল ভাবে আছে। আর লজিক যেই ঢুকছে তখন দেখছে-আরে! অমুক মহবী নেতা, অমুক রেলিজনের নেতাকে আমরা তো মাথায় তুলে নেচেছি, আদিখ্যেতা করেছি। আরে! এ তো দেখছি পাণ্ডা-ইজম্, পুরোহিত-ইজম্, গুরু-ইজম্ তৈরী করে গেছে, মানুষের কোন কল্যাণই করে নি। আরে! অমুককে নিয়ে তো আদিখ্যেতা করেছি, ও তো মানুষের মধ্যে সাত'শ জাত তৈরী করে দিয়ে মানুষকে খণ্ড বিখণ্ড করে' ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আরে! অমুককে বড্ড বড় মানুষ ভেবেছিলুম আর ও তো ন্যাশন্যাল সোস্যালিজমের (national socialism) নাম করে ৰাকী সমস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষতির কারণ হয়ে থেকে গেছে।

এরকম ভাবে তখন সে বিচার করে দেখে কারণ তখন সেন্টিমেন্টালিটি গ্রুপিজমের মধ্যে আবদ্ধ ছিল আর যেই লজিক এসেছে অমনি সেন্টিমেন্টালিটিটা টোল খেয়ে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রুপিজমেও আঁচড় লেগে গেছে যে না, না, ও পথটা তো ঠিক নয়-একটা পৃথিবীর যত জীব, সব একই সূত্র থেকে এসেছে,

তাদের চরম পরিণতিও একই লক্ষ্যে, একই টার্মিনাসে-একই ডেসিডারেটামে (desideratum)। তাহলে তাদের থাকার অধিকার, বাঁচার অধিকারও তো সমান, প্রয়োজন তো সমান।

"সবাই আমরা সমান বুঝি
শীতাতপ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা,
· কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি,
বাঁচিৰার তরে সমান যুঝি।"

তা এই যে মানুষের সেন্টিমেন্টালিটি-আশ্রিত যূথবদ্ধভাব, গোষ্ঠীগত ভাব এইটাকেই ৰলি সোসিও-সেন্টিমেন্ট। জিও-সেন্টিমেন্ট যতটা ক্ষতিকর, সোসিও সেন্টিমেন্ট তার চেয়ে কোটি গুণ বেশী ক্ষতিকর। কারণ জিও- সেন্টিমেন্ট মানুষকে স্বচ্ছন্দ চিন্তাধারা থেকে যতটা দূরে রাখে, সোসিও- সেন্টিমেন্ট তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে রাখে। পৃথিবীতে যে গোষ্ঠীগত ভাব বা যূথবদ্ধ ভাব যার পেছনে থাকছে কেবল অসংখ্য কুসংস্কার- আশ্রিত সেন্টিমেন্টালিটি, তা মানুষের মধ্যে যতক্ষণ দানা বেঁধে থাকে ততক্ষণ মানুষের নির্মল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে যতক্ষণ না

তার মধ্যে একটা র‍্যাশন্যালিষ্টিক মেন্টালিটি জাগছে। এই র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটি না জাগা পর্যন্ত মানুষ অন্য গ্রুপের ক্ষতি তো করেই, অধিকন্তু সেই গ্রুপেরই ছোট ছোট অংশেরও (sub-group) ক্ষতি করে। ছোট ছোট অংশ বলতে বুঝি যেমন গ্রুপের স্বার্থ আর নিজের পরিবারের স্বার্থ। পরিবারের স্বার্থ তো ব্যষ্টিগত স্বার্থ। ব্যষ্টিগত জীবনের অনেক আশা- আকাঙ্ক্ষা পরস্পর বিরোধী স্বার্থ যা পারিবারিক বা সামূহিক আশা- আকাঙ্ক্ষার বিরোধী, পরিপন্থী। এই যে সেন্টিমেন্টালিটি ও গ্রুপিজম্ এই যদি সমাজ থেকে মানে নিজের গ্রুপটা থেকে, যূথটা বা পরিবার থেকে বা ব্যষ্টিগত সামর্থ্য বা অসামর্থ্য থেকে নিজের পুষ্টির খোরাক না পায় তাহলে সে সিনিক হয়ে দাঁড়ায়। আজ মানুষের সেন্টিমেন্টালিটি বাড়ছে, গ্রুপ-মেন্টালিটি ৰাড়ছে (group mentality based on sentimentality) অথচ মানুষের লজিক সেই পরিমাণে প্রোৎসাহিত হচ্ছে না। সেই হারে তো লজিককেও বাড়তে হবে। সে হারে বাড়ছে না যার ফলে উন্মাদ রোগের সংখ্যা বেশী, আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী। এগুলো হচ্ছে সমস্তই সেন্টিমেন্টালিটির ফলে তথা সেন্টিমেন্টালিটি-আশ্রিত গ্রুপ-মেন্টালিটির ফলে (sentimentality and group mentality based on sentimentality)। একটা বিশেষ গ্রুপ যাকে বলেছিলুম সোসিও-সেন্টিমেন্ট সে যখন সেই গ্রুপটার সামাজিক-অর্থনৈতিক (socio-

economico- political) কল্যাণের কথা ভাবে, তখন সে অন্য গ্রুপের সোসিও- ইকনমিকো-পলিটিক্যাল স্বার্থের কথা ৰেৰাক ভুলে যায়। আর এই ভুলে যাওযার ফলে হয় কি?-না, যূথে-যুথে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ হয়। আবার এই সংঘর্ষে যারা জয়ী হতে চায়, সংঘর্ষে যারা অন্যকে পরাভূত করতে চায় তারা বোকাল সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ভোকাল সাইকোলজির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শান্তির বাণী প্রচার ক'রে বলে-এই অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ কর, ওই অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ কর অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে সাইকোলজিটা কেমন যেন হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের মধ্যে তো সেন্টিমেন্টালিটি পুরো রয়েছে ও গ্রুপিজম, সেন্টিমেন্টালিটি-আশ্রিত জেব সত্তা ও মানাসকতা ডেমিসোস্যালিজম (groupism, demi-socialism based on sentimentatity) পুরো রয়েছে অর্থাৎ তারা হ'ল পৃথিবীর এক নম্বরের কপটাচারী (hypocrite)। তাদের ভেতরকার নীতি হচ্ছে "Preach the gospels of peace but keep your powder dry." তাদের বক্তব্য হচ্ছে-কী? "মুখে শান্তির ললিত বাণী প্রচার করে যাও কিন্তু তোমার বারুদ গরম রাখ, তৈরী রাখ যাতে যে কোন সময় তোপে ঢালা যায়"। বর্তমান পরিস্থিতিতে সভ্যতা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই যে গ্রুপ মেন্টালিটি, এই যে সেন্টিমেন্টালিটির ওপর আধারিত

ডেমিসোস্যাল সাইকোলজি, এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে ও তা করতে গেলে প্রথম দফায় যেমন বলেছিলুম যে ষ্টাডিজের দরকার-পড়তে হবে, র‍্যাশন্যালিষ্টিক মেন্টালিটি গড়তে হবে। তা তো করতেই হবে, অধিকন্তু তাদের জন্যে আরও দরকার কী?-না, এক টা ভিত্তিভূমি তৈরী করে ফেলতে হবে যার কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষ সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে পারবে। আর সেই কঠিন মাটিটা হচ্ছে কী?- না, ভাবা যে, সৰ জীব এসেছে তারা যতদিন আছে বাঁচতে চাইছে, স্বেচ্ছায় পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাইছে না। সুতরাং তাদের বাঁচবার অধিকার দাও, তাদের থাকার অধিকার দাও। আর যাতে তারা তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে চলে যেতে না পারে সেই রকম তাদের রসদ যুগিয়ে চল অফুরন্তভাবে অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, ৰাসস্থান ইত্যাদির পুরো ব্যবস্থা করে দাও যাতে সেই মানুষ যতদিন বেশী সম্ভব পৃথিবীতে থাকুক, পৃথিবীর সম্পদ হিসেবে থাকুক ও তাদের আগে চলার, এগিয়ে চলার পাথেয় অফুরন্ত হোক। এই মানসিকতাটাই হচ্ছে সম- সমাজ তত্ত্ব। এই সম-সমাজতত্ত্বের আধৃত সত্তা হিসেৰে থাকৰে মানুষের জীবনের সব রকমের অভিব্যক্তি ও অভিব্যক্তির সমাহার।

(কলকাতা, ১৪ই মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

সমসমাজ তত্ত্ব

চলা জগতের ধর্ম। চলে চলেছে বলেই এই পৃথিবীর নাম 'জগৎ'। 'গম্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন যার মানে হ'ল-চলা যার স্বভাব। ব্যষ্টিগত জীবনে যেমন চলতে হয় সমষ্টিগত তথা সামূহিক জীবনেও তেমনি চলতে হয়। কিন্তু এই যে চলা, এই চলার জন্যে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন আছে। একটা হচ্ছে-চলার জন্যে একটা সম্প্রেষণ, পেছন থেকে একটা ধাক্কা। যখন চলাটা বন্ধ হয় তখন ধাক্কা দিয়ে বলতে হয়-চল্, চলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নিজে যে চলবে তার চলবার সামর্থ্য থাকা চাই অর্থাৎ চলার উপযুক্ত রসদ তার থাকা চাই। নইলে সে

চলবে কী করে? আর তৃতীয় হচ্ছেঃ চলবে একটা লক্ষ্যের দিকে। এই তিনটে জিনিস চাই।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যূথবদ্ধ ভাবে তথা একক ভাবে যে চলে এসেছে সে চলার আজও বিরাম নেই। সে চলার পথে কোন যতিচিহ্ন নেই বা থাকবে না। এটা অপরিচ্ছেদ–কোন কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ এতে নেই। মানুষ সাধারণতঃ চলে কিসের প্রেষণায়, কিসের শক্তিতে, আর কিসের দিকে লক্ষ্য রেখে? দেখা গেছে মানুষ চলে দুটো ভাবে। এই দুটো ভাবের আমি নাম দিয়েছি সম্প্রতি লিখিত "সভ্যতার আদি বিন্দু- রাঢ়" পুস্তকে। একটা হচ্ছে আত্মসুখ তত্ত্ব, আরেকটা হচ্ছে সম-সমাজ তত্ত্ব।

আত্মসুখ তত্ত্ব হচ্ছেঃ যা কিছুই করছি সুখ পাবার প্রেষণায়, সুখ পাৰার পদবিক্ষেপে আর পরে সুখে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। এই আত্মসুখ তত্ত্ব জিনিসটা ভাবজড়তার (dogma) ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক যতগুলো তত্ত্বের দ্বারা মানুষ সাধারণতঃ পরিচালিত হয় সবগুলো ভাবজড়তার দ্বারা চলে চলেছে। আর এই ভাবজড়তা বা ডগমা জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে আত্মসুখ তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

আত্মসুখের লোভেই মানুষ ভাবজড়তার বশ্যতা স্বীকার করে। অনেক মানুষ যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা কি জানে না যে ভাবজড়তার বশ্যতা স্বীকার করছি, বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি, কাজটা ভাল করছি না! সৰ ৰোঝে, সৰ জানে, সৰ জ্ঞানপাপী, বুঝেসুঝেও তারা ডগমাকে মানে। কেন?-না, তারা দেখে যে এই যে ভাবজড়তা, এটা আত্মসুখ তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা ভালই হোক আর মন্দই হোক এতে অন্যের ভালই হোক আর মন্দই হোক আমি তো কিছুটা সুখ পেলুম। এই মনোভাবের দ্বারা প্রেষিত হয়ে তারা ভাবজড়তার দাস হয়ে পড়ে।

এই সভ্য জগতে লেখাপড়া জানা মানুষও ডগমাকে ডগমা বলে জেনেও মেনে থাকে। কেবল তার মনের কোণে একটা আশা থাকে যে ডগমাকে মানলে লৌকিক জগতে একটা জাগতিক সুখ পাৰ। আর তাই এই সভ্যজগতেও যেখানে জ্ঞানের বিস্তার কিছু কম হয়নি সেখানে দেখছি মানুষ অন্ধের মত ভাবজড়তার বশীভূত হয়ে চলেছে। এই ভাবজড়তার মায়াজাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে, এই ভাবজড়তার লৌহকপাট ভেঙ্গে খানখান্ করে দিতে হবে।

তারপর আসছে সমসমাজ তত্ত্ব। সবাইকার লক্ষ্য পরমপুরুষ। আর পরমপুরুষের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি ব্যষ্টিগতভাবে ও সামূহিক ভাবে। কিন্তু সামূহিক জীবনে যে সমস্ত অসাম্য-বৈষম্য রয়েছে, সেই অসাম্য-বৈষম্যগুলোকে যদি আমি ৰজায় রেখে চলতে চাই তবে চলতে পারব না। বৈষম্যকে এক দিকে দূর করবার চেষ্টা করৰ আর সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলৰ। বৈষম্যকে দূর করতে পারলে সৰাইকার অগ্রগতি দ্রুততর হবে- এই ভাবনায় প্রেষিত হয়ে যদি পরমপুরুষের দিকে চলি তাতে আত্মসুখ নাও থাকতে পারে কিন্তু প্রশান্তি আছে, পরমপুরুষের প্রসাদপ্রাপ্তির নির্মেঘ আনন্দ আছে। তাই সমাজের মানুষ জাতের সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই রকমের একটা তারতম্যবিহীন সমাজ গড়ে পরম তত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলবার যে প্রয়াস-এইটারই নাম সমসমাজ তত্ত্ব।

তাই আমার বক্তব্য এই যে যে সকল বুজরুকি এই সমসমাজ তত্ত্বের পরিপন্থী তাকে বর্জন করব। যে জিনিস এই সমসমাজ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে মানুষকে সাহায্য করবে তাকে সাদরে বরণ করে নোৰ। আর যে তত্ত্ব এর প্রতিকূল তাকে সরিয়ে দোৰ। তাকে পথের কাঁটা জ্ঞানে সরিয়ে দোৰ ও সরাবার ব্যাপারে কোন ভাবজড়তাকে বা কোন মমতাকে অপৌরুষেয় ৰোধে আস্কারা

দোৰ না। এইটাই হবে আজকের মানুষের যথার্থ কাজ। এই কাজ করবার জন্যে সব মানুষকে হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হৰে। অতীতে কে কেমন ছিল তা ভাবলে চলৰে না। সে শাদা কী কালো তা ভাবলে চলবে না। কেবল এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের পরম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে ও সমসমাজ তত্ত্বের ভিত্তিতে নোতুন একটা মানব সমাজ গড়েই আমাদের তা করতে হবে। সমসমাজ তত্ত্বের আইডিয়াটা যখন পেয়েছি, যখন এই আইডিয়াকে বাস্তবায়িত করবার মত শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধি ও আত্মিক-প্রজ্ঞা পেয়েছি, কেন এই সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বার্থসার্থক সর্বার্থসুন্দর আইডিয়ার বলিষ্ঠ রূপকার হিসেবে নিজের ভূমিকাকে সার্থক করে তুলৰ না! কেন পৃথিবীতে এই আসাকে, থাকাকে, নিঃশ্বাসের প্রতিটি বিন্দুকে, অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনকে জড়শক্তিতে, মানসিকতায়, বোধিতে ধন্য করে তুলৰ না।

(আনন্দনগর, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮১)

সূচীপত্র

শোষণ ও অসংস্কৃতি

গোড়াতে একটা কথা বলে রাখি, এই পৃথিবীতে অনেক থিয়োরী এসেছে। অনেক থিয়োরী কিছুদিন থেকেছে.....তারপর আস্তে আস্তে সরে গেছে। আবার অনেক থিয়োরী ধূমকেতুর মত অল্প ক্ষণের জন্যে তার জৌলুস দেখিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। থিয়োরীর অস্তিত্বটা বড় কথা নয়। থিয়োরীর ক্ষেত্রে বড় কথা হ'ল সে মানুষের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে। সে 'সর্বজনহিতায়' 'সর্বজনসুখায়' 'জগৎকল্যাণার্থম্' কাজ করে গেছে কি না, অন্যথায় তার আসাটাই অপ্রয়োজনীয় ছিল। তাদের সম্বন্ধে কিছু বলাটাই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে কল্যাণের বীজ-এই বীজটা তখনই থাকতে পারে কোন থিয়োরীতে যদি তার আপাত-ভূমিটা হয় সমসমাজতান্ত্রিক। আর সে সুদীর্ঘকাল অনন্তকালও থাকতে পারে যদি সে অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে সৰাইকার কল্যাণের ভাবনা সব সময় পোষণ করে থেকে থাকে। এইটাই হ'ল ৰড় কথা।

আমি এর আগে কয়েক বারই বলেছি, এখনও বলছি যে মানুষ অন্তর্জগতের দিকে চলে, আবার বহির্জগতে তার সামঞ্জস্য

বজায় রেখে, ইকুয়িলিব্রিয়াম (অস্তিত্বগত সন্তুলন) তথা ইকুয়িপঈজ (ভারগত সন্তুলন) ৰজায় রেখে তাকে চলতে হয়। যদি কেউ ৰলে দেন "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"। তাহলে মিথ্যার জগতে বসে তার কাজ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সে নিজেকে ঠকাচ্ছে, এটা কপটতার (hypocrisy), শঠতার লক্ষণ। সৎ মানুষ জীবনের কোন ভূমিতেই কপট (hpocrite) হবে না, কোন অবস্থায়ই হবে না। কোন অবস্থায় সে কোন রকম অনুচিত তত্ত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া (pact) করবে না। এইটাই নিয়ম.....এইটাই উচিত। ঔচিত্য এই কথাই বলে। সুতরাং তোমরা যারা খাঁটি মানুষ হতে চাও, অন্তর্জগতে যেমন সাধনা করবে তোমরা ঈশ্বর সম্প্রাপ্তির প্রয়াস অনলস ভাবে চালিয়ে যাবে, তেমনি বহির্জগতেও তোমরা দেখবে যে জগতের মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারে এমন কোন অযৌক্তিক, অপ্রিয় অথবা ক্ষতিকর থিয়োরী পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে কি না। সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি সেই জন্যেই বলেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের মুখর (vocal) হতে হবে। অন্যথায় এ কাজ হবে না।

মানুষের বাইরের জগতে তার রেলিজন, তার কালচার, তার সামাজিক জীবন, তার রাজনৈতিক জীবন, তার অর্থনৈতিক

জীবন-এগুলো রয়েছে। কে এগুলোকে অস্বীকার করবে! যে অস্বীকার করে সে শঠতা করছে। সে সত্যের অপলাপ করছে। সে রকম মানুষ কোন কালে নিজের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ করতে পারে না। আর সে মানুষ সব সময় দ্বৈত রোগে (dualistic ailment) ভুগবে। অর্থাৎ বাইরেরটা একরকম, ভেতরটা আরেক রকম। দু'রকম হবার ফলে দু'য়ের যে সংঘর্ষ (duality within a single personality)-এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাধির সূচনা করবে। আর সেই ব্যাধি তাকে শেষ করে দেবে। এই যে সম-সমাজতন্ত্র বা এই যে নিওহিউম্যানিষ্টিক আইডিয়া এটা মানুষকে এই দ্বৈত রোগ থেকে মুক্তি দেবে ও এই দ্বৈত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ায় সে নিজের কল্যাণ করতে পারবে। যতটুকু তার সামর্থ্য তাই দিয়ে সে অন্যের কল্যাণও করতে পারবে। মনে রেখো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সামর্থ্য কিছুটা থাকে।

এখন হয় কি, সামাজিক ভাবপ্রবণতা, গোষ্ঠী ভাবপ্রবণতা-তারও রকমফের আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই। যেমন অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে গোষ্ঠী করে রেখেছে, সেই যে ছোট গোষ্ঠী-তাকে আমরা বলি ব্যষ্টিগত পরিবার। আবার তার চেয়েও বড় গোষ্ঠী আছে-কাষ্ট, কমিউনিটি, ট্রাইব, ন্যাশন্যালিটি,

এই গোষ্ঠীগুলোর পেছনে নিহিত আছে একই মানসিক দুর্বলতা তথা একই মানসিক ব্যাধি। এই ব্যাধির ফলেই মানুষ নিজেকে এক একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকে দেয় ও এই আটকানোর ফলে সে এক এক ধরণের কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকে। কখনও কখনও সেই সম কমপ্লেক্সে যারা ভুগছে সেই রকমের লোকেরা তারিফ করে, বাহবা দেয়, বলে-"ৰাঃ ৰাঃ! কী সুন্দর বলছেন, কী সুন্দর কাজ করছেন লোকটি!" কিন্তু আসলে এই তারিফটা আসে সমান কমপ্লেক্সে যারা ভুগছে, সমান সাইকিক্ কমপ্লক্সে যারা ভুগছে, তাদের পক্ষ থেকে। চোরের দলের একটা চোর বলে- 'ওঃ ওমুক চোরের হাতসাফাই মারভেলাস, আমায় বেশ বোকা বানিয়ে দিলে মাইরী'! প্রশংসা, কারণ ওই একটা গণ্ডী। কিন্তু যে অ-চোর সে সেটা সমর্থন করবে না। এই একটা জিনিস। তা স্পষ্ট কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে যার গণ্ডীটা একটুানি বড় সে একটুখানি ছোট গণ্ডীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে-নিন্দা করে। যে মানুষটা ফ্যামিলিটুকু নিয়েই বসে আছে, আর কোন কাজ করে না, সে মানুষটা অফিস করে আর গুটি গুটি ক'রে বাড়ী এসে কেবল খবরের কাগজটার পাতা উল্টে নেয়। যে মানুষটা একটা কাষ্ট নিয়ে একটা গোষ্ঠী করেছে যেমন 'সর্বভারতীয় অমুক সম্মেলন', এর যারা উদ্যোক্তা-তারা কী করবে?-না, ওই ফ্যামিলিটার নিন্দা করবে–বলৰে ও তো কেবল ফ্যামিলিটা

নিয়েই আছে। আবার যারা একটা কমিউনিটি নিয়ে, ধরো 'অখিল ভারত অমুক' বা আর একটু বড় কমিউনিটি বা 'সম্প্রদায়' নিয়ে গোষ্ঠী করে তারা বলে- 'দূর। জাতপাত নিয়ে রয়েছে-জাতপাত নিয়ে থাকলেই চলবে?' আবার যাদের মনটা আরও বড় তারা বলবে, 'দূর' এ সমস্ত কাষ্ট; কমিউনিটিও তো ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ৰাংলায় যাকে বলে জাতীয়তা তার বিরুদ্ধে। ওই বলে কাষ্ট কমিউনিটি নিয়ে মাথা ঘামালে আমাদের ন্যাশ্যানালিটির বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়বে-ওরা রাষ্ট্রের শত্রু। সুতরাং ওরা আমাদের সমাজের ক্ষতি করছে। ওরা সম্প্রদায়বাদ প্রচার করছে, এ করছে, তা করছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে তারাও ওই একই রোগে ভুগছে-তবে গণ্ডীটা একটু বড়। অথবা তারা এ কথাটা মনেও রেখেছে যে তারাও একই রোগের রোগী, কেবল স্বার্থ অন্ধ হয়েই এ ধরণের উক্তি ক'রে চলেছে। এই রকমভাবে যত বড়ই গণ্ডী হোক না কেন, যদি গণ্ডীভুক্ত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে সোসিও-সেন্টিমেন্টের আওতার মধ্যে এসে যায়। আর যেখানে গণ্ডীর বন্ধন নেই সেটাই সোসিও-সেন্টিমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি সেইগুলোকে বলছি জেনার্যাল হিউম্যানিজম্। সেটাও এমন কিছু বড় বা এমন কিছু আদিখ্যেতা করবার জিনিস নয়।

এখন সোসিও-সেন্টিমেন্টে হয় কি, না এক ধরণের গ্রুপ শোষণ করে আরেককে, আবার সেও শোষণ করে আরেককে। এই হিন্দু সমাজে তোমরা লক্ষ্য করবে জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ ভেদ খুব আছে। সেজন্যে তোমরা অনেককে হাল্কা ভাবে বলতে শুণৰে যে 'ব্রাহ্মণেরাই এর জন্যে দায়ী" । আর যে এই কথা বলছে যে ব্রাহ্মণেরা দায়ী সে কিন্তু তার চেয়ে তথাকথিত ছোট জাতকে ছুঁচ্ছে না স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলছে। অন্যেরা আবার আরও দু'তিনটে জাতকে দোষী করছে কিন্তু তারা আবার তাদের চেয়ে তথাকথিত ছোট জাতকে ছুঁচ্ছে না। তেঁতুলে বাদী বলছে, "দুলে ৰাদী আমার চেয়ে ছোট, ওকে ছোঁৰ না"। আবার সেই তেঁতুলে ৰাঙ্গী ৰলছে, "ব্রাহ্মণদের জন্যেই আমরা ধ্বংস হয়ে গেলুম"। আসলে এটা হ'ল কি?-না, একটু আগে যা বলেছি সেই একই মনের রোগ। একটা গণ্ডীতে যে বদ্ধ হয়ে আছে সে অন্য গণ্ডীগুলোর নিন্দে করে। তোমরাও জেনে রাখবে-তোমরা এভাবে কখনো বলো না যে অমুকদের জন্যে হিন্দু সমাজ ধ্বংস হ'ল। এরকম বলাটা ভুল। তুমি নিজেও এর জন্যে দায়ী।

এখন এই রকম স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলবার যার সাহস আছে, যে বলে গণ্ডীটাকে দাও ভেঙ্গে চুরমার করে, তার পথটাকে বলা হয় কী? না, বিপ্লবের (revolution) পথ। আর যে বলে

"আস্তে আস্তে হবে,-অত তাড়াহুড়োর কী আছে"-এটা হ'ল ক্রান্তির (evolution) পথ। সে কখনও কোন বড় কাজ করতে পারে না। আবার কিছু লোক আছে যারা সোজা বলে, “না বাবা-ঠাকুরদাদা-পূর্বপুরুষ এটা মেনেছে- আমি এর বিরুদ্ধে কি করে যাব?” তারা হ'ল কি?-না, প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary)। তার মনের রোগটা কী রকম?-না, নোতুন কিছুকে গ্রহণ করতে সে ভয় পায় অর্থাৎ He suffers from fear complex | মুখে যত বড়ই কথা বলুক না কেন, সে ভীতমন্যতায় (fear complex) ভোগে। তারা তো বরং পদে আছে। তারা মুখে বলে, "আমার ৰাৰা ঠাকুরদাদা যা করে গেছে-করছি।" তা, অবশ্য তার ৰাৰা, ঠাকুরদাদা পায়ে খড়ম পরত, সেলাই করা জামা পরত না, চাদর জড়াত, চীনী খেত না-গুড় খেত, আর কলের জলও খেত না। আমি একজন মহিলাকে জানি, তিনি কলের জল খেতেন না। বলতেন, "ওই যে জল কলে (water works) সাত'শ জাতে কাজ করে, ওই জল আমি খাই কী করে!” তিনি নির্ভেজাল গঙ্গা জল পান করতেন, যেন গঙ্গাজলটা কেবল কুলীন ব্রাহ্মণেরাই ছোঁয়। এগুলোর পেছনে কাজ করে ফীয়ার কমপ্লেক্স অর্থাৎ পুরোনোকে ছেড়ে নোতুনকে বরণ করতে এই যে অনীহা এর পেছনে কাজ করে যাচ্ছে কেবল একটা ভীতমন্যতা। তা' এই যে সোসিও-সেন্টিমেন্ট, এর দ্বারা সামাজিক স্তরে একে অন্যের ক্ষতি করে,

শোষণ করে-অর্থনৈতিক স্তরে করে, সাংস্কৃতিক স্তরে করে, আবার রেলিজনের স্তরেও করে।

সামাজিক স্তরে প্রথমতঃ একটা জিনিস হয়। যাকে শোষণ করতে চাইছে তার মধ্যে ফীয়াব কমপ্লেক্সের সূচিকা প্রয়োগ (inject) করে দেয়। তার মধ্যে এই ভাবটা জাগিয়ে দেয় যে তুই ছোট, আমি বড়। এই ফীয়ার কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করার ফলেই ভারতের তথাকথিত ছোট জাতেরা নিজেদের সত্যিই ছোট মনে করে, স্বভাবগত ভাবেই করে। তাদের যদি হাত ধরে চৌকিতে, খাটেতে বসতে দেওয়া হয় তবুও সে বসতে চাইবে না। কারণ যুগ যুগ ধরে ভীতম্মন্যতায় ভুগে ভুগে ওদের মানসিকতাই ওই রকম হয়ে গেছে। আর ঠিক তেমনি যারা অন্যের মধ্যে ফীয়ার কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে তারা পরোক্ষভাবে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে অন্যদের ওপর, আর নিজেদের মধ্যে সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে। এই করে গ্যাপটা দেয় বাড়িয়ে। সমাজের কাঠামোটা যায় ভেঙ্গে। এতে সুসংবদ্ধ (well-knit) সমাজ থাকতে পারে না। এই রকমভাবে যদি যাদের মধ্যে মহামন্যতা আছে তাদের হাতে সামান্যতম ক্ষমতা থাকে তারা এইভাবে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করে অন্যান্য কাজগুলো হাসিল করে নেয়। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে বা ৫০

বছর আগে দেখেছি রেলে কিছু কামরায় এমন ব্যবস্থা থাকত যাতে প্যান্ট পরে গেলে চাপতে দেওয়া হত, ধুতি পরে গেলে হ'ত না। এটা কী?-না, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করা হচ্ছে। এই সূচিকা প্রয়োগ করার ফলে কী হ'ল-না, মানসিক শোষণ ওইখানেই হয়ে গেল আর তাকে ভিত্তি করে অন্যান্য স্তরে শোষণের সুবিধা হয়ে যাবে। ইংরেজীতে কথা বলতে না পারলে মুখ্যু বলে মনে করা হত, এখনও মনে করা হয়। ইংরেজীতে যখন বলতে পারছে না তখন ও মূর্খ, অথচ সে মানুষটা হয়তো সংস্কৃতে বিরাট পণ্ডিত। এটাও এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট করার পরিণতি। এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ইনজেক্ট ক'রে দেওয়ার মানেই হ'ল তার ওপর মানসিক শোষণ চালানো। তা' সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম হয়। কোন জায়গায় দেখলে, বিশেষ করে সেকালে দেখা যেত কোন কিছু সাইনবোর্ড বড় বড় করে লেখা রয়েছে এমন একটা ভাষায় যে ভাষা স্থানীয় ভাষাই নয়। সাইনবোর্ড থাকে কেন?- না, স্থানীয় জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যে যে কোন জিনিসটা কী। এই ৰড় করে লেখাটা যদি শাসক-শোষকের ভাষায় থাকে আর শাসিত শোষিতের ভাষায় না থাকে অথবা থাকলেও শাসকের ভাষার চরণতলে কৃপাধন্য হিসেবে থাকে তাহলে শাসিত-শোষিতের মনে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে! তাদের মনে নিজের ভাষা (দাসের

ভাষাকে ইংরেজীতে ভারনাকুলার বলে) ও আত্মপরিচিতি সম্বন্ধে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স জাগবে.....তারা মানসিক ব্যাধিতে ভুগতে থাকবে। এইভাবে তাদের মনের ওপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে শাসকের ভাষা নৈবেদ্যের মণ্ডার মত চূড়োয় বসে থাকে। আর লোকের মধ্যে এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি হচ্ছে-'সত্যিই তো এটা রাজার জাতের ভাষা গো।' সুতরাং ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এল। যেই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এল তখন তার ওপর মানসিক শোষণ চলতে থাকল। তা সামাজিক স্তরে এই সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা যারা পরিচালিত হয় তারা এইভাবে শোষণ চালায়। তার জীবনের অন্যান্য ভূমিতেও এই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স প্রথমে ইনজেক্ট করে দেয়। তারপরে মানসিক শোষণ চলে। মানসিক শোষণ দ্বিভৌমিক। কখনো কেবল মানসিক স্তরেই হয়, আবার কখনো আধা-মানসিক, আধা অন্যান্য ভূমিতে অর্থাৎ মানসিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভূমিতে শোষণ চলে-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক রেলিজন সবেতেই। তাই এর আগে একবার আমি বলেছিলুম যে জিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা মানুষের যত ক্ষতি করা যায়, সোসিও সেন্টিমেন্টের দ্বারা তার চেয়ে কোটি গুণ বেশী ক্ষতি করা যায়। এই সোসিও-সেন্টিমেন্টে হয় কী! মানুষ ভুলে যায় তার স্বাধিকার, ভুলে যায় সে মানুষ, ভুলে যায় মাথা উঁচু

ক'রে বাঁচবার অধিকার তারও আছে। তাই সোসিও-সেন্টিমেন্ট আরও বেশী ক্ষতিকর। এখন এই যে সোসিও- সেন্টিমেন্ট অন্যের মনে যে হীনমন্যতা জাগিয়ে দিয়ে সাইকিক এক্সপ্লয়টেশন করে (সাইকিক এক্সপ্লয়টেশন অন্যান্য শোষণের ভিত্তিভূমি) -ওর ওপরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য শোষণগুলো হতে থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ওই রকম।

একটা জনগোষ্ঠী যে বিশেষ ধরণের সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত (guided by a particular type of socio-sentiment) আরেকটা জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে। শোষণ করবার আগে তাদের মনে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দেয় যে তারা ছোট-এরা বড়। যেহেতু ওরা ৰড় তাই ওদের অধিকার বেশী-তাই শোষণ করবারও ওদের অধিকার আছে। ওরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তোরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তোমরা খুঁটিয়ে দেখবে, বিশ্বের সর্বত্রই যেখানে একটা জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক স্তরে শোষণ করছে সেখানে তারা সেই শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কী করছে, না, প্রথমেই সাইকিক এক্সপ্লয়টেশন তৈরী করছে তাদের মনের মধ্যে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে দিয়ে। তাই যেখানে যে অর্থনৈতিক শোষণ রয়েছে, খুঁজলে দেখবে তার পশ্চাৎপটে অবশ্যই রয়েছে মানসিক

শোষণ। আরও খুঁজলে দেখবে তারও পশ্চাৎভূমিতে রয়েছে মনের মধ্যে হীনমন্যতা (inferiority complex) তৈরী করবার এক নিরলস ও শঠতাপূর্ণ প্রয়াস।

অর্থনৈতিক স্তরে শোষণ করতে গেলে দু'প্রকারে করা যায়। একটা হ'ল সোজা মানস-অর্থনৈতিক শোষণ যা ইতোপূর্বে বললুম আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ। যেখানে পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ সেখানে তার সঙ্গে যদি মানস-অর্থনৈতিক যোগ দেয় তো সোণায় সোহাগা। এই পলিটিকো-ইকনমিক শোষণের বলি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এককালে ছিল-এখনও অনেক দেশ রয়েছে। শুধু দেশ বলি কোন-জনগোষ্ঠীও। অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে (মানে যে পলিটিকো-ইকনমিক হোক আর মানস-অর্থনৈতিক হোক) মানুষকে বাঁচাতে গেলে তাদের মধ্যে সচেতনতা (consciousness) আনতে হবে। সচেতনতা না আনলে তারা মানস-অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতে পারবেই না, পলিটিকো- ইকনমিক শোষণের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারবে না।

ভারতের মানুষের মধ্যে সচেতনতা না জাগিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে শেষ

পর্যন্ত রাজনৈতিক (political independence) স্বাধীনতা মানুষ পেল কিন্তু রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও পায় নি। আজও সে মানস-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত হয়ে চলেছে। আবার দেখ, যেটা মানস-রাজনৈতিক শোষণ (psycho-political) অথবা রাজনৈতিক স্তরের শোষণ, সেটা কীরকমভাবে হয়!-না, একটা জনগোষ্ঠী সোসিও সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আরেকটা জনগোষ্ঠীর ওপর সৰলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। তাদের পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে যে ওই শোষিত জনগোষ্ঠী বা শোষিত দেশ, (এখন দেশের চেয়েও জনগোষ্ঠীটা বড় কথা। এটা একটু পরে আরও ৰলৰ) ওই ভূমিটাকে আমি কাঁচা মালের যোগানদার হিসেবে নোেৰ, মাল তৈরী হবে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে, আবার ওই শোষিত ভূমিটাকে আমার তৈরী মালের বাজার হিসেবে পাৰ। এখন যে জনগোষ্ঠীরা আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত, তারা কী করে! শক্তিশালী জনগোষ্ঠী অথবা শক্তিশালী দেশের কাছে মাথা বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়-হয় শক্তির অভাবের জন্যে অথবা ভীতমন্যতার ফলে অথবা আর্থিক অনটনের ফলে। আর মাথা বিকিয়ে যাবার পরে তার ফলশ্রুতি কী হয়। -না, দ্বিতীয় স্তরে তারা তাদের ভূমিকে বা জনগোষ্ঠীকে কাঁচা মালের যোগদানদার হিসেবে ও তৈরী মাল কেনবার বাজার হিসেবে দেখতে পায়।

অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। এই জিনিসগুলো মানস-অর্থনৈতিক শোষণের ফলে হয়, আবার পলিটিকো-ইকনমিক শোষণের ফলেও হয়-দুটোতেই হয়। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই ভেবে দেখবে, বিচার করে দেখবে কোন্টা কী ধরণের হচ্ছে। যেখানে শক্তির বলে, জড় শক্তির বলে হয় তা পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ। আর যেখানে জড়শক্তির বলে হচ্ছে না, বুদ্ধির বলে, চালাকির দ্বারা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানস-অর্থনৈতিক শোষণ। এখন পলিটিকো-ইকনমিক শোষণই হোক আর মানস-অর্থনৈতিক শোষণই হোক এর ফলশ্রুতিটা হয় কী!-না, যারা শোষক-যারা শোষণ করছে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তারা শোষিতদের কেবল যে শোষণই করে তা নয়, শাসনও করে। কারণ শাসন কাজ অব্যাহত থাকলে শোষণ ভালভাবে চলে। আর যারা পরোক্ষভাবে করে তারা কী করে! নিজেরা শাসন করে না, শাসকদের অর্থবলে ক্রয় করে নেয়। আর এই অর্থবলে ক্রয় করার পরিণামটা কী হয়।-না, শাসককুল যাদের অর্থে ক্রীত হচ্ছে তাদেরই মনোরঞ্জন করে, তাদের টাকায় নির্বাচনে জয়ী হয়, তাদের সব রকমের মনোরঞ্জন করে আর মুখে তারা আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তলে তলে এই জিনিসটাকেই সমর্থন করে। এই যে জিনিসটা হ'ল যাকে আমি নাম দিয়েছি বাকসর্বস্ব

বিপ্লবী (vocal revolutionist)। মুখে বড় বড় কথা বলবে শোষণের বিরুদ্ধে, আর কার্যক্ষেত্রে তলে তলে সেইটাই করে যাবে! আমি বলেছিলুম এর চেয়ে কিছুটা ভাল হল কী!-না, রিফর্মিষ্ট- যারা বলে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করা যাক। কিন্তু তাদেরও মতলব থাকে যাতে শোষণের রথ অব্যাহত থাকে। তোমরা পৃথিবীতে অনেক রিফর্মিষ্ট দেখেছ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সমাজের কল্যাণ চায়নি, তারা একটু উনিশ-বিশ করে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে চেয়েছিল। পৃথিবীতে এমন অনেক লোককে দেখেছ যারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলেছে- "না, সবাই সমান, সৰাইকার ছোঁয়া খাব। আমাকে যদি একটা পরিষ্কার ধোওয়া গ্লাসে ভাল ফিল্টার করা জল দেয় খাব।... এই খেয়ে নিলুম।" সবাই হাততালি দিল, বললে "এই তো। এই তো! এই তো।" সে হ'ল কি!-না, রিফর্মিষ্ট। সে তলে তলে জাতটাকে বজায়ই রাখতে চাইছে। সে যদি জাতিভেদ বজায় রাখতে না চাইত, তাহলে বলত, "এই অস্পৃশ্যতার মূলীভূত কারণ হ'ল জাতপাত ভেদ। তবে না উচ্চ-নীচ হয়েছে, তবে না অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়েছে, তবে না জাত-পাত তৈরী হয়েছে-ভেঙ্গে দাও জাত-পাতের বন্ধন।" এ সাহস যদি তার থাকত সে হ'ত বিপ্লবী। কিন্তু এ সাহস তাদের ছিল না ও তারা বিপ্লবকে বিলম্বিত করে দিয়ে মানুষের বেশী ক্ষতি করছে।

যুগ-সংস্কারক রিফর্মিষ্ট যাঁরা তাঁরা সমাজের কল্যাণকামী নন। বরং তাঁরা সমাজের ত্রুটিগুলোকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। তাদের পাকে প্রকারে জিইয়ে রাখতে চান। তাদের মধ্যে হয় ভীতমন্যতা ছিল অথবা ছিল শঠতার নোংরামি। আর এই পলিটিকো ইকনমিক শোষণ যা চলে থাকে তা শেষ পর্যন্ত শোষিত মানুষের চোখ যখন খুলে দেয়, তাদের সমর্থন ও আদিখ্যেতা তখন তথাকথিত যুগ সংস্কারকদের থেকে সরে যায়। যে সব শোষকেরা প্রত্যক্ষভাবে পলিটিকো-ইকনমিক শোষণ করে চলেছে, অথবা যারা প্রত্যক্ষভাবে মানস-অর্থনৈতিক শোষণ করে চলেছে, পরোক্ষভাবে শোষকদের সমর্থন করছে-তারা শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন হারাবেই হারাবে। কারণ, মানুষের যখন চোখ খুলে যায় তখন আর কোন ধরণের চালবাজি টিকতে পারে না। সেই সময় ব্যুরোক্র্যাসির সাহায্য ছাড়া এক পা-ও তারা চলতে পারবে না। আর এই বুরোক্র্যাসির দ্বারা, সম্প্রেষিত হয়ে তাদের সব কাজ করতে হয়। তখন তারা আর চোখ- খুলে-যাওয়া জনগোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে পারে না, তারা চলতে পারে না। আর এইভাবে চলতে চলতে ধাপে ধাপে অৰাধভাবে সেই বুরোক্র্যাসি এক ধরণের ওলিগার্কির কাছে মাথা নোয়ায়। এক ধরণের বিশ্রী ওলিগার্কি সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত

চেপে বসে। মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি। এর হাত থেকে মুক্তির উপায় হ'ল কী! না, মানুষের মধ্যে চেতনা এনে দাও, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তাদের চোখ খুলে দাও। তারা বুঝতে শিখুক–কী! কেন! কোথায়! কী হচ্ছে! তাই ষ্টাডির দরকার আছে-একশ'বার আছে। আর এছাড়া রয়েছে মানব মনের ওপর রেলিজনের মাতব্বরি। তোমরা জান রেলিজন জিনিসগুলো মোটামুটি বিচারে ভাবজড়তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর রেলিজনের প্রচারকরা কী করেছে। -না তারা কখনও ভাগবত ধর্মের প্রচার করেনি, উদার মনুষ্যধর্মের সর্বানুস্যুত ভাগবত ধর্মের প্রচার তারা কোনকালে করেনি, তারা তাকে ভয় পেয়েছে, এড়িয়ে গেছে। তারা কী করেছে? সব সময় বলে গেছে যে যেটা আমি বলছি সেটা আমার কথা নয়, ওটা ভগবানের কথা-আমি ভগবানের দূত। অর্থাৎ আমি যা বলছি সেটা আমার কথা মনে করো না। এটা ভগবানের কথা, তাই এটা তোমাকে মানতেই হবে। প্রশ্ন করবে না যে কথাটা ঠিক কি ভুল। প্রশ্ন করা পাপ। তাহলে আলজিব খসে যাবে। অর্থাৎ মানুষকে তারা ভাবৰজড়তার বন্ধনে আরও বেঁধে রেখেছে। যাতে সেই গণ্ডীর বাইরে এক পা-ও সে চলতে না পারে। এক-পা চলতেও তার ভয় হয়। "ওরে বাবা! পাপ হবে। অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে।"

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ভাবজড়তার বন্ধনে যারা আবদ্ধ করে রেখেছিল তারাই তথাকথিত রেলিজনের গুরু ইত্যাদি। তারা মানুষের চরম ক্ষতি করে গেছে। আর, এক গণ্ডীৰদ্ধ জীব, গণ্ডীৰদ্ধ রিলিজিয়াস গ্রুপ আরেকটার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কারণ দুটোর মধ্যে তো কোন মিল নেই। এ উত্তরে যায় তো ও দক্ষিণে যায়। ভগবানের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করেছে। বলেছে, এটা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। এই ভাৰেই একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপকে তাদের শোষণের ভূমি হিসেবে পেতে চায়। যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি রেলিজনের ক্ষেত্রেও এটাই হয়। তারা তাদের নিয়ে স্যাটেলাইট গোষ্ঠী তৈরী করতে চায়। যেমন একটা অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী একটা অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে নিজের স্যাটেলাইট হিসেবে পেতে চায় অর্থাৎ ওদের কাছ থেকে কাঁচা মালটি নেবে, নিজের কারখানায় তৈরী করবে আবার তৈরী মাল ওদের দেশকে কিনতে বাধ্য করাবে। ঠিক তেমনি এই রেলিজনের ক্ষেত্রেও স্যাটেলাইট করবার চেষ্টা করা হয়। আর সব সময় যারা এই স্যাটেলাইট করতে চাইছে তাদের অর্থে পুষ্ট হয়ে এই সৰ তথাকথিত ধর্মপ্রচারকরা নিজেদের দিন কাটিয়ে যায়। এদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানেই না যে তারা একটা

শোষকের স্যাটেলাইট গ্রুপ তৈরী করার কাজে রত। আবার হয়তো কিছু কিছু লোক আছে যারা জানেও। যারা জানে না তাদের কাণে সত্য কথা শুণিয়ে দাও ও নব্যমানবতাবাদ তাদের কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে দাও।

তাদের বুদ্ধি মুক্তিলাভ করবে। তখন তারা তাদের বিভ্রান্তির তকমা ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর যারা জেনেশুণে এই ভাবজড়তার প্রচার করছে, জেনেশুণে অনুচিত তত্ত্বের দালালি করে চলেছে, সত্য কথা প্রচার হতে দেখলেই তারা আরও উগ্র, আরও উদগ্র হয়ে উঠবে। তা' যত পারে উঠুক, যত পারে পাপের ঘড়া উপচিয়ে দিক। নাশ তাদের অনিবার্য, তাদের পাপের বিনাশ দুরপনেয় বিধিলিপি। রেলিজনের ক্ষেত্রেও তোমরা ভালভাবে তাকালে দেখবে যে জেনে বা না-জেনে যারা এই শোষণের কাজ করে চলেছে তাদের পেছনে রয়েছে অর্থশালী সত্তা। তাদের স্যাটেলাইট তৈরী করতে চায়। সর্বস্তরেই দেখবে যে এদের পেছনে রয়েছে কোন না কোন ধনীর পুঁজি।

এরপর আর একটা জিনিস আছে-সেটা হ'ল সংস্কৃতি। তোমরা জান অভিব্যক্তির যেটা মধুরতর সূক্ষ্মতর ভাব সেটাকেই আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃতি বলে থাকি। মনে করো,

তোমাকে কেউ খেতে দিলে, তুমি হাত-মুখ না-ধুয়ে দু'হাতে করে খেতে পার। আবার হাত-মুখ ধুয়ে শুদ্ধ ভাবেও গ্রহণ করতে পার।

এই যে শুদ্ধাচার ও স্বাস্থ্যসম্মত বিধি অনুযায়ী খাওয়া এটাই হ'ল খাওয়ার কালচার। যে সকল কর্মে এই যে মধুরতর, সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তিগুলো রয়েছে সেগুলোই হচ্ছে কালচার। সংস্কৃতি মানুষের এক, তবে বিভিন্ন জায়গায় এর অভিব্যক্তির ধরণ-ধারণে একটু স্থানিক পার্থক্য থাকে। কিন্তু যে জনগোষ্ঠী সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্যকে শোষণ করতে চায় সে অন্যের স্থানিক অভিব্যক্তিগুলোকে নষ্ট করে দিতে চায়। জোর করে একের ওপরে অন্যের ভাষা চাপায়। জোর করে একের ওপরে অন্যের পোষাক চাপায়, অন্যের চিন্তাধারা চাপায় ও এইভাবে মানসিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে দিয়ে শোষণের আরও সুবিধা করে নেয়। তা' সাংস্কৃতিক জীবনে এইভাবে চলে শোষণ। আর এই শোষণ করে তারা! যারা সোসিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা অভিপ্রেষিত।

পৃথিবীতে এই হয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে নিরীহ, নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে বাঁচাৰার মহৎ দায়িত্ব কি তোমাদের নয়?

নিশ্চয়। যারা আগে জান নি তারা জানছ অথবা অন্যের মুখে শিখে জানবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে-কেন নিরীহ মানুষ এইভাবে বলির পাঁঠা হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। কিছুতেই এ সহ্য করা চলে না। মনে করো, কোন একটা জনগোষ্ঠীর সিনেমা, থিয়েটার বেশ উচ্চ মানের কিন্তু সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে শাঁসাল ধনীর সংখ্যা কম। আরেকটা কোন জনগোষ্ঠীর থিয়েটার, সিনেমা অতি নিম্ন মানের কিন্তু সেখানে শাঁসাল ধনী লোকের সংখ্যা বেশী। তারা ওই উচ্চ মানের সংস্কৃতির ওপর শোষণ বজায় রাখতে চায় কারণ মানস- অর্থনৈতিক শোষণ মানসিক স্তরেও পঙ্গু করার আরেকটা পথ এই হচ্ছে কী!-না, সাংস্কৃতিক শোষণ। সেই ভালো মানুষগুলোর ঘাড়ে খারাপ সিনেমা, খারাপ নাটক সমস্ত চাপিয়ে দেওয়া। জান তো মানুষের স্বাভাবিক মন অধোমুখী। নীচের দিকে যত সহজে যায় ওপরের দিকে তত তাড়াতাড়ি ওঠে না। সুতরাং খারাপ সিনেমা, খারাপ নাটক অর্থবলে যদি তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তা হলে কী হবে!-না, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে, পঙ্গু হয়ে যাবে। আর এই পঙ্গু মানুষগুলো, মেরুদণ্ডহীন মানুষগুলো আর ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক শোষণ বা অন্য কোন রকম শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না-পারতেই পারে না, কেননা মানসিক দিক দিয়ে তাদের শেষ করে দিলুম। তাদের মাথা

তোলৰার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিলুম। আর তারা মাথা তুলৰে কী করে! এই যে সাংস্কৃতিক জীবনে শোষণ সেটা করা হয় অসংস্কৃতির মাধ্যমে। সেইন অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিটি সৎ প্রতিটি ধার্মিক, প্রতিটি বিচারশীল মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে আর অন্যকে এ কাজে প্রেরণা জোগাতে হবে। তা না . হলে মানুষের ভবিষ্যৎ থাকে না। মানুষ রাজনৈতিক শক্তির জন্যে লড়াই করে গেল, সামাজিক মুক্তির জন্যে লড়াই করে গেল বুঝলাম, কিন্তু যদি সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল তাহলে সৰ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা' হবে ভস্মে ঘৃতাহুতির সামিল। যদি কারও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অসংস্কৃতির বোঝায় যার ঘাড় পিঠ ভেঙ্গে দুমড়ে গেল সে কি মাথা উঁচু করে জীবনে অন্য কোন ভূমিতেই সংগ্রাম করতে পারবে! কিছুতেই পারবে না। তাই অসংস্কৃতির হাত থেকে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করা প্রতিটি বিচারশীল মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য।

(কলকাতা, ২১শে মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

মেকি মানবতাবাদ

বলছিলুম সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতার কথা (সোস্যাল সেন্টিমেন্ট)। সেন্টিমেন্ট যেখানে এককত্বের সীমা ডিঙিয়ে যায়, একের বেশীকে নিয়ে হয় তখনই সে সোস্যালের আওতার মধ্যে আসে। কিন্তু এর অন্তটা কোথায়? ব্যাসার্ধ (radius) যেমন শূন্যকে নিয়ে হয় না তেমনি অনন্তকে নিয়েও হয় না। অর্থাৎ শূন্যের বেশী ও অনন্তের কম এই রকম একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত রচনা করতে হয়। আর সেই অবস্থাতেই এর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়-স্বীকৃত হয়। তার কম হলে বা বেশী হলে অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে যায়; অস্তিত্ব তখন থিয়োরীতে থাকলেও বৈবহারিক ক্ষেত্রে থাকে না। যা ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট সেটাও একটা সোসিও-সেন্টিমেন্টের অঙ্গ। এর ব্যাসার্ধ বড্ড ছোট। এর চেয়ে বড় ব্যাসার্ধ হচ্ছে জাতৰুদ্ধি প্রবণতা (caste sentiment), সম্প্রদায়বুদ্ধি প্রবণতা (community sentiment), জাতীয়ৰুদ্ধি প্রবণতা (national sentiment) ইন্টারন্যাশান্যাল সেন্টিমেন্ট ও আরও কত প্রবণতা। এখন সোস্যাল সেন্টিমেন্টের মধ্যে যে সেন্টিমেন্ট সব চেয়ে ছোট সেটাকে বলতে পারি "যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা–সর্বাল্প" (socio-sentiment minimities)। আবার থিয়োরীতে

সেটা সৰ চেয়ে ৰড় তাকে বলতে পারি "সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা-সর্ব বৃহৎ" (so- cial sentiment maximities) বা "সমাজকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা- সর্বাতীগ" (social-sentiment excellencio)। এখন আমাদে র দেখতে হবে যে এই দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্যটা কী।

এক্সসেলেন্সিও ও ম্যাক্সিমাইটিস-এর মধ্যে যে থিয়োরীটিকাল দূরত্ব (gap) আছে তাকে থিয়োরীতে যদি পূরণ করি তাতে মাটির পৃথিবীর তথা ধূলার ধরণীর মানুষের কোন কল্যাণ হবে না। কেবল থিয়োরীর আকাশে সে উড়ে বেড়াৰে। পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র-এই নিয়ে আগেকার দিনে পণ্ডিতেরা লড়াই করতেন। তাল পড়বার পরে ঢপ্ শব্দটা হয় না ঢপ্ শব্দটা হবার পরে তাল পড়ে-এ নিয়ে এক কালে পণ্ডিতরা তর্ক করতেন। শোণা যায় একবার নবদ্বীপে পণ্ডিতেরা এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাল ঠিক পড়ছে এমন সময় ঢপ্ শব্দ হয় না পড়ার পরে হয়-তিন দিন তিন রাত পাঁচ'শ পণ্ডিত তর্ক করেছিলেন। তাতে পাঁচ মণ নস্যি খরচ হয়েছিল। তারপর তৃতীয় দিন রাত্রি যাপনের পর প্রভাত হ'ল। তখন দেখা গেল পণ্ডিতেরা সবাই ইহলীলা সংবরণ করেছেন। কী হয়েছিল!-না, তাদের কারও মাথায়, কারও পিঠে তাল পড়েছিল। তা এখন এই যে সোস্যাল সেন্টিমেন্ট সেটার স্টেজ অব এক্সেলেন্সিও অথবা ইন থিয়োরী,

ম্যাক্সিমাইটিস- এটাকেই বলতে পারি মানবতাবাদ (humanism)। কোন একটা বিশেষ নেশনকে নিয়ে কাজ করছিলুম। এখন সব নেশনকে নিয়ে কাজ করছি। যখন অস্তিত্ব তলে তলে নেশনের মানছি আর বলছি সৰ নেশনকে নিয়ে কাজ করছি তখন সেটা হিউম্যানিজ়ম্ হ'ল না-ইউনিবাস্যালিজম্ তো অনেক দূরের কথা-এটা হ'ল ইন্টারন্যাশন্যালিজম্।

এখন 'ইন্টারন্যাশন্যালিজ়ম্' শব্দটা যখন ব্যবহার করলুম তখন সঙ্গে সঙ্গে যেমন নেশনের পৃথক অস্তিত্ব মানলুম তেমনি অস্তিত্ব মানার সঙ্গে সঙ্গে তার পঞ্চ প্রয়োজন অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থানের কথা মানলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর প্রাণরস শোষণ করে নিজেকে পরিপুষ্ট করতে চাইছে-এটাও দেখলুম। এটা দেখতে পেয়ে এর বিরোধিতা করলুম ও বিরোধিতা করতে গিয়ে আবার বিশ্বযুদ্ধ। সুতরাং ইন্টারন্যাশন্যালিজমে সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি নেই। তাহলেকী?-না, নেশন বা ইন্টারন্যাশন্যালিজমের কথা বাদ দিয়ে পরিধিটা আরও একটু বড় করে দিলুম, বাড়িয়ে দিলুম-দিয়ে সমস্ত মানুষকে তার মধ্যে টেনে নিলুম। সমস্ত মানুষকে তার মধ্যে টেনে নিলুম-এইটাই হ'ল হিউম্যানিজম্। যাকে আরও ভাল

করে বলতে গেলে বলতে হয় অর্ডিনারী বা জেনারেল হিউম্যানিজম্।

এখন এই হিউম্যানিজষ্টা হ'ল কী! না, সোসিও সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস্। এই যে সোসিও সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস- এটাতেই কি সৰ কিছুর নিদান পাওয়া যাৰে? এটাতেই কি সৰ কিছুর প্রতিশোধ, সমাধান হবে?-না, হবে না। দুটো কারণে হবে না। একটা কারণ হচ্ছে যে দেক্ষেত্রে ইন্ট্রা-হিউম্যানিষ্টিক ক্ল্যাস থাকৰেই আর দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে যে, প্রাণী-জগতে মানুষই একমাত্র প্রাণীন্ সত্তা নয়, আরও অনেক প্রাণীন্ সত্তা রয়েছে। তাদের কথা না ভাবলে বাইরের জগতে হয়তো সংঘর্ষ হবে না কারণ অ-মানব প্রাণীরা মনের দিক দিয়ে অবনত (শরীরের দিক দিয়ে উন্নত হলেও মনের দিক দিয়ে অবনত)। তাই তাদের ধ্বংস করে দিতে পারা যাবে-জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ দুইকেই। কিন্তু এই যে ধ্বংস করে দেওয়া, এটা মানুষের জীবনে আরও বড় ধ্বংস ডেকে আনবে, আরও বড় বিপর্যয়ের উত্তরণ ঘটাবে। জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও মনুষ্য জগতের মধ্যে তার ফলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মনুষ্য জগতে যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ (intra-clash) সেই ইন্ট্রা- ক্ল্যাসটা কী ধরণের! ভাবছি অমুক জনগোষ্ঠীর মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তাদের মুখে খাদ্য জুগিয়ে দিই-এটা একটা মানবিক ব্যাপার ঠিকই। কিন্তু তলে তলে ভাবছি এই সুযোগে ওই জনগোষ্ঠীটাকে আমার কাঁচা পণ্যের যোগানদার ও তৈরী পণ্যের বাজার হিসেবেও পাৰার চেষ্টা করি..... কারণ লোকগুলি তো অনুগৃহীত হয়ে রইল। এই ধরণের যে মানসিতা বা শর্ত তা-ই একদিন অঙ্কুরিত হয়ে, পল্লবিত হয়ে মানব সমাজের শান্তি নষ্ট করে দেবে। সুতরাং এই হিউম্যানিষ্টিক্ এ্যাপ্রোচের মধ্যে ভেজাল রয়েছে, খাদ মেশানো রয়েছে। মনে করছি যে. অমুক জনগোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষায় অনগ্রসর আহা! ওরাও তো মানুষ, 'ওদের মূক মুখে ভাষা এনে দিই, ওদের ছাপার অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিই-তা-ই করলুমও। কিন্তু শিক্ষার ভেতর দিয়ে এমন জিনিসের সূচিকা (injection) প্রয়োগ করে দিলুম যা সেই অঞ্চলের মানুষকে শিক্ষিত করৰে কিন্তু পঙ্গু করে দেৰে। অর্থাৎ এই পঙ্গু মানুষ ঘুরে ফিরে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে এসে যাবে (They will be governed as a colony people.)। এতে বিশ্বের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো সবই ইন্ট্রা-হিউম্যান ক্ল্যাস। সোস্যাল স্ফীয়ারে নিজের পছন্দমত ভাবে তাদের গড়ে তুলৰ আর তাদের স্বকীয়ত্ব ধ্বংস করে দোৰ। এই মনোভাব কাজ করবেই। এই

মনোভাব কেন কাজ করছে?-না, আমি দয়া করছি-এই অহম্মন্যতা, এই মহামন্যতাই আমার উপযুক্ত মোসাহেব, আমার উপযুক্ত স্যাটেলাইটে পরিণত করতে শেখাবে। সুতরাং এই যে খাদমিশ্রিত মানবিকতা (humanity)-এ মানবিকতা নয়, এ হিউম্যান সেন্স, হিউম্যান স্পিরিট নয়-এটা হচ্ছে অর্ডিনারী হিউম্যান সেন্টিমেন্ট যা প্রকারান্তরে স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কেমন?-না, যেমন স্যুডো রিফর্মিষ্ট স্ট্রাটেজি হয়। স্যুডো রিফর্মিষ্ট স্ট্রাটেজিটা কী রকম হয়?-না, অমুক জিনিসটা আমার প্রতিপক্ষ যা বলছে (এ কাজটা হয় একেবারে সোসিও-সেন্টিমেন্টের ভেতরে) তা সঙ্গত কথা। অথচ এটা যদি কার্যরূপ নেয় আমার অসুবিধে হৰে অথবা আমার ইণ্ডিভিজুয়াল সেন্টিমেন্ট বাধা প্রাপ্ত হবে তখন কী করছি! ঠিক আছে, ঠিক আছে জিনিসটা মানিয়ে নিচ্ছি, বেশ মানিয়ে (adjust) নিচ্ছি-এই ভাবে, এই ভাবে করৰো-তোমরা এতে সন্তুষ্ট তো! আচ্ছা, আচ্ছা, বড় পরিবর্তন চাইছি না, ধাপে ধাপে করছি, ধাপে ধাপে করব-এই সমস্ত বললুম। কিছুটা ভাষণ দিলুম, বললুমও আর তলে তলে কিন্তু কোনও পরিবর্তনই হতে দোৰ না। এটাকে বলি স্যুডো রিফর্মিষ্টিক স্ট্রাটেজি অর্থাৎ প্রাক্সম সংস্কারবাদাত্মক রণনীতি। আর স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি হচ্ছে, মুখে মানবতার ললিতবাণী প্রচার করছি আর তলে তলে

মানবতার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করছি কারণ দৃঢ় ভিত্তির অভাবে এই ধরণের অর্ডিনারী হিউম্যান সেন্টিমেন্ট একটা চপলতাপূর্ণ (vascinating) অবস্থায় থাকে। এই জিনিসটা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চলে চলেছে। আর যাতে বেশীদিন না চলে সেইজন্যে তোমাদের চেষ্টাশীল হতে হবে। এই ইন্ট্রা-হিউম্যানিজম-ইন্ট্রা- হিউম্যানিষ্টক ক্ল্যাস এটা ঘটে চলেছে যার ফলে মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে- গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। কারণ কী?-না, কারণ এই যে তথাকথিত অর্ডিনারী হিউম্যানিজম বা জেনারেল হিউম্যানিজম, এটা ন্যাশ-ন্যালিজমেরই একটা বর্ধিতায়ত অবস্থা (enlarged form); গোড়ার দিকেই বলছিলুম যে রেডিয়াসটা বড় (maximities)-এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহলে এখন দেখ রোগ হিসেবে সোসিও-সেন্টিমেন্ট মিনিমাইটিস আর সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাকসিমাইটিস দুটোই মানসিক ব্যাধি। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, যদিও দুয়ের ব্যাসার্ধের রকমফের রয়েছে। মানুষটা একই ব্যাধিগ্রস্ত। শরীরের একটা জায়গায় অল্প পরিসরে একটা ব্যাধি রয়েছে আর একটা বড় পরিসরে সেই ব্যাধিটাই রয়েছে। এখানে রোগটা এক, পরিধির তফাৎ রয়েছে মাত্র। এই যে ম্যাক্সিমাইটিস অথবা এক্সেলেন্সিও তা' যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতার মধ্যে থেকে থাকে ও তা' মানুষের সামনে

আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ডেকে আনে। শুধু তাই নয়। মানুষে- জীবে-উদ্ভিদেও পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেয়। মনকে হিউম্যানিজমে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি নিয়ে এগোলে পাকে প্রকারে উপকৃত জনগোষ্ঠীকে নিজের সোস্যাল সেন্টিমেন্টের আওতার মধ্যে এনে ফেলা হচ্ছে। তাই তাদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শোষণ একদিন হৰেই-আজ হয়তো হচ্ছে না, কাল হবে; এবেলা হয়তো হচ্ছে না, ওবেলা হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো আরও বেশী।

একটা মজার জিনিস আছে যা লোকে তাকিয়ে ভাবছে না। যাকে আমরা অর্থোন্নত (developed) জনগোষ্ঠী বলছি-কিছুকে বলছি অর্থোন্নত, কিছুকে বলছি উন্নতিশীল (developing), কিছুকে বলছি অনুন্নত (undeveloped)- সেই অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী কেউ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। তারা অবস্থার চাপ সৃষ্টি করে উন্নতিশীল ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে শিল্পজাত তৈরী মাল কিনতে বাধ্য করাচ্ছে। নিজের সম্পদের উৎকর্ষ ঘটিয়ে কেউ অর্থোন্নত হচ্ছেনা। আর যারা নিজের সম্পদের উৎকর্ষ ঘটিয়ে অর্থোন্নত হচ্ছে তাদের পোটেনসিয়ালিটি সবাইকার সমান না থাকায় একদিন পোটেনসিয়ালিটির অন্ত হবে। আর পোটেনসিয়ালিটির অন্ত হলে তখনই তাদের অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি

প্রয়োগ করতে হবে; বৌদ্ধিক শক্তি অথবা জড় শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। তাই যতক্ষণ নেশনের বেড়াজাল রয়েছে, শুধু নেশনের কেন ম্যাক্সিমাইটিসের বেড়াজাল রয়েছে (মিনিমাইটিসের কথা তো বলছিই না) ততক্ষণ অন্যকে শোষণ করার বৃত্তি ব্যষ্টিগত বা সামূহিক জীবন থেকে দূর হবার নয়। এরই জের রাজনৈতিক জীবনে আসতে বাধ্য। এর জের রেলিজনের জগতেও আসতে বাধ্য। আর কালকেই ৰলেছিলুম যে স্যাটেলাইট তৈরী করার জন্যে রেলিজনের প্রচার করা হয় বা যারা প্রচারক তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অন্যায় কাজটাই করছে। কারণ তার পেছনে রয়েছে এমন কোন জনগোষ্ঠীর পুঁজি যে জনগোষ্ঠী হয় কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে ওই মানুষগুলোকে পেতে চায় অথবা তৈরী মালের বাজার হিসেবে পেতে চায়-অর্থাৎ স্যাটেলাইট্ হিসেবে পেতে চায়। তাই রেলিজনের জগতে রয়েছে পুরো মাত্রায় আবিলতা। এই রেলিজনগুলো ভাগবত ধর্ম নয়, সর্বানুস্যূত মানবধর্মও নয়।

এই কল্মষ রয়েছে সাংস্কৃতিক জীবনেও (cultural life)। কারও কালচারাল লাইফটাকে যদি কিনে নেওয়া যায় তাহলে তাকে চিরতরে দাসে পরিণত করা যায়। তাই যারা শাসক ও শোষক তাদের মধ্যে যদি সোসিও-সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস্

থাকে যাকে জেনারেল হিউম্যানিজম্ বলি তা থাকে, তাহলে সে সোস্যাল, ইকনমিক, কালচারাল, পলিটিক্যাল ও রেলিজনের জগতে শোষণ করতে চাইবে। তাই এ চরম নিদান দিতে পারে না, এ মানুষের পক্ষে চরম পথ নয়। একটা জনগোষ্ঠী-যদি আমি তাকে ইন্টারন্যাশন্যালিজম নাম. দিলুম অথবা সোস্যাল সেন্টিমেন্ট- সোস্যাল গ্রুপ-একসেলেন্সিও নাম দিলুম, তারা কিন্তু বৰাকী মনুষ্যেতর জীব (মনে রাখতে হবে, গাছপালা পশুদেরও বাঁচার আকুতি আছে, তারা স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেয় না) অর্থাৎ বৃক্ষরাশি বা জীবকে ধ্বংস ক'রে বেঁচে থাকতে চায়। এই যে ধ্বংসের বীজ যে কেবল ইন্টার- ক্রিয়েচার ওয়ার্লডে আছে তা' নয়-ইন্ট্রা-ক্রিয়েচার অর্থাৎ হিউম্যান ওয়ার্লডেও ঘুরে ফিরে আসে। আজ পশুর ওপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে-কাল এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর মানুষের ওপরও সেই নির্যাতন করতে পারে। কারণ নির্যাতন করার বীজ তার রক্তে কিল্বিল্ করছে। রোগ তার সারেনি, সে মুখেই বড় বড় কথা বলছে। তাই একটু আগেই বলছিলুম, জিনিসটা স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজি নয়। মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, চাষের জমি বাড়াবার জন্যে, কলকারখানা ৰাড়াবার জন্যে কী করা হয়? -না, বড় বড় জঙ্গল কেটে ফেলা হয় কিন্তু সেই জঙ্গলের জীবেরা, আরণ্য জীবেরা কোথায় যাবে

তা ভাবা হয় না। সুতরাং হাতী, ৰাঘ প্রভৃতি শহরে গ্রামে এসে জোটে, মানুষকে মারে, ঘর-দোর নষ্ট করে। কেন করে? বাঁচার তাগিদে করে। তাদের বাসস্থান অরণ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা যাবে কোথায়। এটুকু ভেবে দেখিনি যে তাদের বাসস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে-না, তা ভাবি না। অরণ্য কেটে নিঃশেষ করে দিই। ভাবি না যে অরণ্য কাটার ফলে জীব জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ আর মনুষ্য জগতের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আরও ভাবিনা যে এই জীবজগৎ আর উদ্ভিদ জগৎকে ধ্বংস ক'রে মানুষের লাভ হবে না-ক্ষতিই হবে। কারণ জীব জগতের এক একটা সত্তা বা উদ্ভিদ জগতের এক একটা সত্তা-তাদেরও দু' ধরণের মূল্য আছে। একটা তাদের উপযোগ মূল্য; অপরটা তাদের আস্তিত্বিক মূল্য। যে সমস্ত জীবের বর্তমানে উপযোগ মূল্য আছে মানুষ তাদের বাঁচিয়ে রাখে। যেমন গোরুকে বাঁচিয়ে রাখে। আজ ঘোড়ার উপযোগ মূল্য ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ পথে-ঘাটে ঘোড়া দেখা যায় না। কিছুদিন পরে কেবল চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঘোড়া দেখতে হবে। অন্যত্র ঘোড়া পাওয়া যাবে না। সে মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে না, মানুষের কাছে তার উপযোগ মূল্য শেষ হয়ে গেছে, তাই মানুষ তাকে আর বাঁচাচ্ছে না। যখন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সিনথেটিক দুধ মানুষ আবিষ্কার করবে তখন সে গোরু পোষা ছেড়ে দেবে। সেদিন

মানুষ গোরুগুলোকে হয় না-খাইয়ে মেরে দেবে না হয় নিজেরাই তাদের খেয়ে নেবে। এই হচ্ছে অবস্থাটা। মানুষের কাছে উপযোগ মূল্য যার নেই তার বাঁচার অধিকার নেই-এ কথা কে বলে! এ কথা বলবার কারো নৈতিক অধিকার নেই। বাঁচার অধিকার কেবল মানুষের আছে, আর মনুষ্যেতর জীবের নেই এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। সৰাই ধরিত্রীর সন্তান, পরম পুরুষের সন্তান-এখন মানুষের কাছে থাক বা না থাক অধিকাংশ জীবের আস্তিত্বিক মূল্য আছে। আমরা তাদের যে আস্তিত্বিক মূল্য আছে তা' জানি না। এই আস্তিত্বিক মূল্য অনেক সময় একক, অনেক সময় যৌথ, অনেক সময় দুই-ই। অনেক সময় আমরা জানতে পারি না যে উপযোগ মূল্যটা কী, যৌথ মূল্যটা কী! ভাবি ওদের আস্তিত্বিক মূল্য নেই। সেটাও মহামূর্খতা। জ্ঞানভূমিতে মানুষ খুব বেশী এগোয়নি বলেই এই ধরণের ভুল ক'রে বসে। এমনকি মানুষের কাছে যার উপযোগ মূল্য নেই বা ফুরিয়েছে-আস্তিত্বিক মূল্য নেই বা ফুরিয়েছে-তেমন জীবেরও বাঁচবার অধিকার আছে। এমনকি যার উপযোগ মূল্য দূরের কথা, নেগেটিব ইউটিলিটি ব্যালু রয়েছে, এন্টিটেটিব-পজিটিব ব্যালু নেই, নেগেটিব এন্টিটেটিব ব্যালু রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও ধ্বংস না' করে উপযুক্ত পরিবেশে তাদের বাঁচাৰার চেষ্টা করতে হবে। আর তারা যাতে মানুষের মধ্যে ক্ষতিকর না হয়ে উঠতে পারে সেজন্যে

উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুরক্ষা ব্যবস্থা না রাখার ফলে সেই অল্পবুদ্ধি জীবেরা যদি মানুষের ক্ষতি করে সেজন্যে ত্রুটি সেই জীবটার নয়-মানুষের। মানুষের বুদ্ধি আছে, কেন সে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেয়নি। আরও একটা জিনিস হচ্ছে যে আস্তিত্বিক মূল্য মানুষের কাছে মানুষের যতটা, জীবের কাছেও জীবের ততটা। মানুষ হয়তো বুঝতে পারে যে তার আস্তিত্বিক মূল্য আছে, অন্য জীব হয়তো বুঝতে পারে না-এতটুকুই তফাৎ। কিন্তু বুঝতে পারে না ৰলে সে হতভাগ্যকে ধ্বংস করৰ-এ অধিকার মানুষের হাতে কেউ তুলে দেয়নি। এখন এই যে সোস্যাল সেন্টিমেন্ট ম্যাক্সিমাইটিস, এর মধ্যে এই অর্থোন্নত জনগোষ্ঠী থাকছে। একটা মানব সমাজের মধ্যে বিভিন্ন বিভাজন ঘুরে ফিরে থেকে যাচ্ছেই-প্রত্যক্ষে না থাকুক পরোক্ষে থেকে যাচ্ছেই-আর যার ফলে ইন্ট্রা-হিউম্যান ক্ল্যাসের বিষটা থেকেই যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ইন্টার-ক্রিয়েচার বিষটা থেকে যাচ্ছে ও এই ইন্টার-ক্রিয়েচার যে ক্ল্যাসটা তাতেও মানুষ তাদের উপযোগ মূল্য (utility value) ও আস্তিত্বিক মূল্য (entitative value) বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। তাই জিনিসটা কোনক্রমেই ত্রুটিমুক্ত বলে গণ্য হবার নয়। মানুষকে পারফেকশনের জন্যে আরও এগিয়ে চলতে হবে–'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' আরও দু'পা এগোতে হবে ও সেন্টিমেন্টের গণ্ডী ডিঙিয়ে সামনের

দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। সামনেও কি কোনও উজ্জ্বলতর প্রভাত তার জন্যে অপেক্ষা করছে না? নিশ্চয় করছে।

(কলকাতা, ২২শে মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

জাগ্রত বিবেক

মানুষকে যতগুলো বন্ধনের সম্মুখীন হতে হয় সেই ৰন্ধনগুলো কেবল যে জড় জগতের তাই নয়, তারা মানসিক জগতেরও, এমনকি আধ্যাত্মিক জগতেরও বটে। জড় জগতের যে বন্ধনগুলো রয়েছে, সেই ৰন্ধনের পেছনে মূলীভূত কারণটা মানসিক জগতে থাকছে। মানুষ মানুষের ওপরে অত্যাচার করছে, শোষণ করছে-জড় জগতে করছে বটে কিন্তু করছে তো তার মনেই। আর যে ব্যথাহত মানুষ এজন্যে মর্মবেদনা অনুভব করছে তার সে বেদনাও তো জড়ের চেয়ে বেশী মানসিক। তাই শেকড়টা, ৰন্ধনটা মনেতেই। তবে সেই মন জড়-নিরপেক্ষ, জড়-

বর্জিত নয়। জড়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা জড় সম্বন্ধীয়। তার পাঞ্চভৌতিক জগৎটা জড় সম্বন্ধীয়। আবার এটা কেবল যে জড় বা মানসিক তা-ই নয়, এ অধ্যাত্ম জগৎকেও ছুঁই ছুঁই করছে। অর্থাৎ এই মানসিক ব্যাধিগুলোর ফলে এমন ধারা একটা অদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে অধ্যাত্ম জগৎও তাতে নাড়া খেয়ে যায়। মনে কর একটা ধর্ম ব্যবসায়ী! এখন সে এমন অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে যার ফলে প্রকৃত অধ্যাত্ম জগৎটাও বিপন্ন হয়ে যায়। এর ফলে সেই নাড়া খাওয়া মানুষ আধ্যাত্মিকতাবিমুখ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ এ ব্যাধিটা মানসিক জগতে হলেও এটা জড়ের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত তথা আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই ধরণের দানব-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ মানুষকে জড়-জগৎ থেকেই যে ৰঞ্চিত করছে তা নয়, মানসিক জগতেই যে প্রৰঞ্চনা করছে তাও নয়, অধ্যাত্ম জগতের সম্পদ থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছে। ভেবে দেখ এই ধরণের মানুষেরা কত বড় মানসিক আবর্জনা বয়ে চলেছে। এই যে ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতাবাহী মানুষ জিও-সেন্টিমেন্ট, সোসিও-সেন্টিমেন্ট ও জেনারেল বা অর্ডিনারী হিউম্যানিষ্টিক সেন্টিমেন্টের মধ্যে রয়েছে–এরা মানুষের ভাল করেনি, করে না, করতে পারেনা, করবার সামর্থ্যও তাদের নেই।

তাদের শুধরে দেবার ব্রত নিতে হবে। আর এই শুধরে দেবার ব্রত নিয়ে তোমরা যে কাজ করবে তাতে দেখবে, যে শোধরাতে চায়না সে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে নষ্ট হয়ে যাবে। তার জীবনে নেবে আসবে মহতী বিনষ্টি। আর এদের মধ্যে যে ক্ষতিকর বা ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সে হিপোক্র্যাসির আড়ালে ঢেকে রাখতে চায়। এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আওয়াজটাই হিপোক্র্যাসির একটা দিক। যেমন সেই বলছিলুম না ৰাকসর্বস্ব বিপ্লবী (vocal revolutionist)। তারা মুখে বিপ্লবের (revolution) কথা বলৰে কিন্তু তলে তলে চাইৰে যাতে বিপ্লব না হয়। তাই দেখছি এই সব মানুষ বাইরে এক, ভেতরে আরেক। এই বর্ণচোরা মাণিকদের চেনা বড্ড শক্ত। যারা প্রতিক্রিয়াশীল (reaction- ary force) তাদের অন্ততঃ চিনতে অসুবিধা নেই। তারা তো প্রত্যক্ষভাবেই ৰলছে যে এটা হতে দোবনা। মানুষের মুক্তি হতে দোৰনা। মানুষকে পেট ভরে খেতে দোৰনা। মানুষকে দারিদ্র্য-জর্জরিত করে রাখৰ। তা না রাখলে আমার বাড়ীতে চাকর জুটৰে কোথেকে!

যাই হোক, যাদের সোজা পথে চেনা যায় না তাদের চেনৰার জন্যে, জানবার জন্যে কিছু কিছু বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। তা এই যে জিও- সেন্টিমেন্টের দ্বারা সম্প্রেষিত হয়ে যে সমস্ত মানুষ

জেনেশুণে অথবা না জেনে বিপথে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে বলেছিলুম যুঝৰার দুটো পথ। একটা হল কী?-না, দরকার হচ্ছে নিবিড় পাঠ (studies), আরেকটা হচ্ছে কী? না, তৈরী করে নিতে হবে একটা র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটি, একটা রেশানালিষ্টিক আউটলুক। এই 'ষ্টাডিজ' মানে হ'ল নিবিড় জ্ঞানচর্চা। জ্ঞানচর্চাটা কী? ইন্টারন্যাল এ্যাসিমিলেশন, সাবজেক্টিভ অ্যাসিমিলেশন অব অবজেক্টিভ হ্যাপনিংস। বহির্জগতে যা কিছু ঘটে চলেছে-মনে রাখবে অস্তিত্ব থাকাটাও একটা ঘটে চলা, সেটাও একটা ঘটনা প্রবাহ। সেইগুলোর আত্মস্থীকরণ হচ্ছে জ্ঞানচর্চা। সেইটাই ষ্টাডিজের মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু এখানে জ্ঞানচর্চার কথা যদি বলি তাহলে প্রথমতঃ তাকে দু'ভাগে ভাগ করতে হয় ও সৰটা ষ্টাডিজের আওতার মধ্যে আসে না।

জ্ঞান দু'ধরণের-পরাজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান (transcendental) আর অপরাজ্ঞান বা প্রাপ্তজ্ঞান (non-transcendental)। ট্রান্সেণ্ডেন্টালটা কাজ করছে সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জগতে আর তার প্রেরণা উৎসারিত হয়ে আসছে বিশ্বের চক্রনাভি থেকে। বিষয় জগতের লাভ-ক্ষতি, শোষণ-শাসনের সঙ্গে তার তিল মাত্র সম্বন্ধ নেই। ইম্পিরিয়ালিজম, ফ্যাসিজ়ম্ আর হাজারো যে 'ইজ়ম্' আছে

তার সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। এ মানুষকে নির্মল আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে চলবার প্রেরণা দেবে-তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে তাকে উৎসাহিত করৰে। এই হ'ল আত্মজ্ঞান। কিন্তু এই ট্রান্সেণ্ডেন্টাল নলেজের নাম ভাঙ্গিয়ে ভাঁড়িয়ে ঈশ্বরের বা অবতারবাদের দোহাই পেড়ে যদি কেউ বিষয় জগতে অল্পজ্ঞ সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার অপপ্রয়াস করে সে বা তারা নিশ্চয়ই নিন্দার্হ। এখানে আমাদের উপজীব্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ নয়। সেটা বিশুদ্ধ দর্শন-অধ্যাত্ম দর্শনের মধ্যে পড়ে। এখন এই বিষয় জগৎ সংক্রান্ত কাজে নন-ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ যে আমাদের সাহায্য করে সেটা নিয়েই আমাদের কারবার। ট্রন্সেন্ডেন্টালের কথা আগেও বলেছি পরেও ৰলৰ।

এখন এই যে ষ্টাডিজ এতে কিন্তু ত্রুটিও আছে। ষ্টাডিজ করলে, খুব জানলে ও শিখলে কিন্তু এই ষ্টাডিজের ভেতরে ভ্রান্তিদোষ আছে,-থাকৰে। হয়তো তোমরা বলতে পার, যে লোকটি লিখতে, পড়তে জানে না সে ষ্টাডিজ কী করে করবে?- না, সেও করবে। যে লিখতে পড়তে জানে তার কাছে শুণে শিখবে। সুতরাং সেদিক দিয়ে তো অসুবিধা নেই।

আর এই ষ্টাডি হচ্ছে কেবল যে বই থেকে, তা নয়। ষ্টাডি একটা পুস্তকীয় (literal), আর অপরটা হচ্ছে অ-পুস্তকীয় (not-literal)। পুস্তকীয়টা যে লেখাপড়া জানে সে বইয়ের মাধ্যমে পাচ্ছে। যে জানেনা সে অন্যের কাছ থেকে তার পুস্তকীয় জ্ঞানটা শিখে নিচ্ছে। আর অ- পুস্তকীয়টা-সেটা হচ্ছে কী?-না, মানুষ বিষয় জগতের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে এসে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত মনের সাহায্যে যা কিছু পাচ্ছে সেগুলির সমাহার। এই যে পুস্তকীয়, অ-পুস্তকীয় ষ্টাডিজ, মনোবিজ্ঞানে যাকে ৰলতে পারি সহজ প্রত্যভিজ্ঞা-এ দুয়েরই সমান প্রয়োজন রয়েছে। আর দুটোই মানুষের হাতের কাছে রয়েছে। এখন ষ্টাডিজে অর্থাৎ পুস্তকীয় আর অ-পুস্তকীয় এ দুয়েতেই ভ্রান্তিদোষ থাকে। তাই একে চরম তথা পরম ৰলে মানতে পারছি না। মানা উচিতও নয়। দুয়েতেই কী থাকে?- না, একটা অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্তি আর অপরটা হ'ল কালৰাধিত ভ্রান্তি। মনে রাখবে শব্দ দুটো ভালভাবে। একটা হ'ল কি?-না, ডিফেক্ট ডিউ টু ইনোরেন্স, আর একটা হচ্ছে ডিফেক্ট ডিউ টু চেঞ্জ ইন টেম্পার। যে লোকটি আমাকে শেখাল বা যে লোকটির লেখা ৰই আমি পড়লুম, এখন সেই লোকটির জানার ভেতরেও তো ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আর সেই ত্রুটিটাও তো পৌনঃপুনিক ভাবে সংক্রমিত হতে পারে! এইটাই হ'ল অজ্ঞতাপ্রসূত। আর দ্বিতীয় ত্রুটিটা হ'ল কালৰাধিত। সেটা

হচ্ছে– যেমন যে কালের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকটা লিখিত হয়েছিল বা যার জ্ঞানটা ৰন্টিত হয়েছিল, সেই কালের যা বাস্তবতা সেইটা সেই পুস্তকে বা সেই উক্তিতে থাকছে। কিন্তু কালের পরিবর্তন যেই হয়ে গেল–কালৰাধিত যেই হয়ে গেল তখন সেই তথ্যটাও তার মূল্য খুইয়ে বসল।

আমাদের ছোটবেলায় ভূগোলের বইয়ে লেখা থাকত যে উত্তর প্রদেশের (তখন নাম অন্য ছিল) রাজধানী এলাহাবাদ। আজ কিন্তু সেটা কালৰাধিত, সেটা আজ ভ্রান্তিপূর্ণ কারণ এখন লক্ষ্ণৌ রাজধানী। কালের পরিবর্তনে রাজধানী' স্থানান্তরিত হওয়ায় সেই সময়কার পুস্তকে যা লিখিত ছিল তা আজ বিভ্রান্তিকর ষ্টাডিজ অথবা ইন্টারন্যাল বা সাবজেকটিক্ এ্যাসিমিলেশন অব এক্সটার্গ্যাল অবজেক্টিবিটি যে হ'ল তা যদি কেবল ষ্টাডির মাধ্যমে হয় তাহলে ভুল হয়ে যেতে পারে। এর উপায় কী? তুমি ভুল করে ফেললে। তুমি ষ্টাডির মাধমে যে জ্ঞানটি আহরণ করলে সেটা ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান। অথচ জিও-সেন্টিমেন্ট-এর দ্বারা পরিচালিত মানুষ অজস্র ভাবে ক্ষতি করে চলেছে। এখন তুমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে ঠিকভাবে চিনতে পারছ না, সেই বহুরূপীটিকে চিনতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে। এখন উপায়! সে

তো তার পাপের পথে চলতেই থাকবে, অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই থাকবে।

সেই ক্ষতি থেকে এককভাবে তুমি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হলে- এককভাবে যদি তুমি লাঞ্ছিত, ভৎসিত, শোষিত হলে তাতে ততটা ক্ষতি নয়। কিন্তু একটা বিরাট জনগোষ্ঠী-জনসমষ্টি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা তো তুচ্ছ জিনিস নয়। তোমাকে চিনতে হবে, এই পৃথিবীতে কারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, কারা বাকসর্বস্ব বিপ্লবী,—কারা সোসিও-ইকনমিকো-পলিটিক্যাল রিফর্মিষ্ট অথবা কারা স্যুডো রিফর্মিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কারা স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে। সৰ তোমাকে জানতে হবে। আর জনসাধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন, অস্তিত্বের সর্বনিম্ন প্রয়োজনকে যারা উপেক্ষা করছে সেই সমস্ত স্যুডো রেবলুশনিষ্টদের চিনতে গেলে তোমার ষ্টাডি যেখানে কাজ করছে না অথচ তোমাকে তাদের চিনতেই হবে। সেখানে তুমি কী করবে? তোমাকে যথার্থ বিশ্লেষণ তো করতেই হবে প্রতিটি জিনিসকে। কারণ আগে তুমি বিশ্লেষণ করবে, তবে না তুমি মানুষকে তাদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাবার পথ-নির্দেশনা দেবে! তাই ষ্টাডির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সেটা তোমাদের করতেই হৰে। ৰইয়ের পাতা বন্ধ রেখে কূপমণ্ডুক হয়ে

থাকলে চলৰে না। দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে, গণ্ডী ভেঙ্গে এগোতে হবে। কোন গণ্ডী? -না, 'জিও'-র গণ্ডী-জিও-সেন্টিমেন্টের গণ্ডী। তা ছিঁড়ে ফেলতে হবে-ভেঙ্গেচুরে দিতে হবে। কুয়োর ব্যাঙ ভাবে, এই কুয়োটাই বুঝি পৃথিবীতে সৰ চেয়ে বড় জলাশয়। কিন্তু সে যখন ডোবা দেখে, ভাবে- না, এটা তো কুয়োর চেয়ে বড় জলাশয়। পুকুর দেখে, তখন ভাবে- না, এটা তো আরও বড়। সমুদ্র দেখে, তখন ভাবে-ওরে ৰাৰা! এ তো অনেক বড়। এতদিন আমি কুয়োর মধ্যে ৰসে থেকে কুয়োটাকেই ভাবছিলুম সৰ থেকে বড়। জিও-সেন্টিমেন্ট না ভাঙ্গলে সত্য তো মানুষের চোখের সামনে প্রতিভাত হবে না। তাই ষ্টাডি-র প্রয়োজন আছে। আবার ষ্টাডি-র এই যে ত্রুটিটা বললুম তা থেকে বাঁচাতেও হবে। একটা পথ বার করতে হবে তো! শেখানো হ'ল যে আমার দেশ অত্যন্ত সুজলা-সুফলা। র্য্যাস্, সেই কথাটা শুণে লোকের কাছে বড় বড় কথা বলে যাচ্ছি, 'আমার দেশ সুজলা-সুফলা'। কিন্তু ষ্টাডি করে দেখলুম কী?-না, আমার দেশে দারুণ জলাভাব। লোকে চাষের জল তো দূরের কথা তৃষ্ণার জলও পায় না। 'আমার দেশে প্রচুর শস্য হয়, দেশ বিদেশে অন্ন বিতরণ করা হয়; আমার দেশ সুফলা'। পরে দেখলুম, বিদেশ থেকে হাজার হাজার টন খাদ্য আমদানি হয়। তবেই আমার দেশের মানুষ বেঁচে থাকে। দূর দেশ থেকে পচা আটা আসে। তবে সেই আটা জলে গুলে কোনক্রমে

আমার দেশের মানুষ প্রাণধারণ করে। অথচ বলছি, আমার সোণার দেশ, তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। এগুলো কেন হচ্ছে?-না, অজ্ঞতা নিৰন্ধন জিও- সেন্টিমেন্টের বেড়াজালে ঘেরা পড়ে গেছি। এই সত্যটা যে জানে সে তখন নিজের বিভ্রান্তির কথা ভেবে হাসে। আর ভাবে, অন্যের কাছে না জেনে যে বড় বড় কথাগুলো বলেছিলুম অন্যে কী ভেবেছিল! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তা এই যে সমস্ত ভুল ধারণাগুলো তৈরী হয় বিভিন্ন জিও-সেন্টিমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে, এগুলো তো ভাঙ্গতে হবে! ষ্টাডি ছাড়া পথ নেই। কিন্তু ষ্টাডিও সৰ কিছু নয়। এখন কিছু সংখ্যক লোক বিশেষ করে যারা 'বোক্যাল রিবল্যুশনিষ্ট', মনে রেখো, তারা বড্ড বড় বড় কথা ৰলে। বড় বড় কথা বলে তোমার মনের যেখানে দুর্বল ও স্পর্শসচেতন অংশ সেগুলোকে নাড়া দিয়ে দেয়। "আমার দেশ এই-আমার দেশ ওই! আমরা অমুক, আমরা বীরের জাত” -এই সমস্ত বলে নাড়া দেয়। আর তুমি যুক্তি-তর্ক বিবর্জিত হয়ে জিও-সেন্টিমেন্টের কঠোর নিগড়ে বদ্ধ হয়ে তুমিও চিৎকার কর সেই সুরে-সেই ধ্বনিতে। চিৎকার করবার সময় ভেবে, দেখ না, এই চিৎকারটা উৎসারিত হয়ে আসছে মিথ্যা জ্ঞান থেকে। এই মিথ্যা জ্ঞানের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তেই হবে। 'আমার দেশের অমুক নদীটার জল এমন যে সে জল পচে না। সে জল এমন যে পান করলে শরীরের প্রতিটি কোষ-মানুষ

তো দূরের কথা, শরীরের প্রতিটি প্রোটোপ্লাজমিক সেল-ও (protoplasmic cell) মুক্তি- মোক্ষ পেয়ে যাবে। অথচ সেই নদীতে কত মাছ ও জলজ জন্তু আছে, তারা মুক্তি-মোক্ষ পাৰে না। আর সেই জল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে ওই জল পান করৰার অযোগ্য তো বটেই, স্নান করৰার পক্ষেও অযোগ্য। এই সৰ জিও-সেন্টিমেন্টের খেলা-রকমারি খেলা!

তাই, ষ্টাডির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। নিজে ষ্টাডি করবে, যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যে সেমিনার করবে। যারা অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত তাদের শুণিয়ে বোঝাবে। তাদের নিয়েও সেমিনার করবে। মানুষের মধ্যে উন্মুক্ত জ্ঞান ছড়িয়ে দাও, ছিটিয়ে দাও। মানুষকে সত্যের আলোকে সব কিছুকে দেখবার সুযোগ করে দাও। প্রতিটি মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত করে দাও। বুদ্ধি আবদ্ধ হয়ে রয়েছে পঙ্কিল জলাশয়ে, পানাপুকুরে, তাকে মুক্তির স্বাদ পেতে দাও। তা ষ্টাডিজের যে ত্রুটিগুলো-অজ্ঞতাপ্রসূত ত্রুটি, কালৰাধিত ত্রুটি (এগুলো সমস্তই, মনে রাখবে, নন্ ন্ট্রান্সেণ্ডেন্টাল-এরা সবাই প্রাপ্তজ্ঞান, আপ্তজ্ঞান নয়। যা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তাই কেবল আপ্তজ্ঞান। সংস্কৃতে আপ্তবাক্যও বলা হয়)-এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে গড়ে তুলতে হবে কী? না, একটা র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটি। বইয়ে আছে বলে সেটাই

সব কিছু বলে মেনে নিলুম-এমনটি চলবে না। বইয়ে আছে-পড়লুম জানলুম কিন্তু মানলুমটা হতে হবে একটু দেরীতে। অর্থাৎ মানলুমটা কখন হবে?-না, পড়া জিনিসকে আমি যাচাই করে দেখলুম। এই যাচাই করে দেখতে গেলে তৈরী করতে হবে একটা র‍্যাশনালিস্টিক মেন্টালিটি। মনে রাখবে, এই ষ্টাডিজটা যেমন সর্বনিম্ন স্তর, র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটি সর্বনিম্ন নয়, ঠিক তার ওপরের স্তর। কোন্ পথে?-না, নিও হিউম্যানিজমের প্রতিষ্ঠার পথে।

নিও-হিউম্যানিজম্ প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম সোপান হচ্ছে 'স্টাডিজ্', দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে 'র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটি' অর্থাৎ বিচারপ্রবণ মানসিকতা। শুণলুম; তারপর দেখব তার 'পজিটিব্ দিক', নেগেটি দিক'; পজিটিটাও দেখব লজিকের সাহায্যে, যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে, নেগেটি দিকটাও দেখব যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে। দু'-ই দেখে দু'য়ের পরিমাপ করব, ওজন করে দেখব। পজিটি দিকটা এগোলে আমার সিদ্ধান্ত পজিটিবের দিকে যাবে। যেখানে পজিটি নেগেটি-ধনাত্মক ঋণাত্মক বিচার করে মাপকাঠিতে ওজনে দেখছি পজিটিটা বেশী, তখন রায় দোব পজিটিবের পক্ষে। যখন দেখব ঋণাত্মক বা নেগেটিবটা ওজনে বেশী ভারী তখন রায় দোব ঋণাত্মকের

পক্ষে। অর্থাৎ বলৰ-না; এটা চলবে না। আর যেখানে রায়টা ধনাত্মকের পক্ষে, বলৰ-হ্যাঁ, এটা চলৰে। এই যে ধনাত্মকের বা ঋণাত্মকের পক্ষে রায় দেওয়া, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্বন্ধে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করা এইটাকেই বলা হয় সিদ্ধান্ত। মনে রাখৰে এই সংস্কৃত শব্দটা। এর ইংরেজী শব্দটা হচ্ছে 'logical decision'- শুধু 'decision' নয়। সিদ্ধান্ত মানে 'লজিক্যাল ডিসিশন'-শব্দের গোলমাল করো না। আর তুমি যেটা দেখলে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক- সেইক্ষেত্রে যে লজিক্যাল ডিসিশনটা পেলে- সিদ্ধান্তটা বললে সেটাও চরম নয়। তোমাকে আরেকটা পরবর্তী ধাপেও যেতে হবে। সেই পরবর্তী ধাপে যাওয়াটা হচ্ছে কী?-না, সিদ্ধান্ত যদি কল্যাণকর হয়, 'সর্বজনহিতায়', সর্বজনসুখায়, লোককল্যাণার্থম্'-তবেই সেটাকে প্রচার করৰ, সমর্থন করৰ, তাকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে মন-প্রাণ লাগিয়ে দোৰ। অন্যথায় ৰলৰ, এটা সিদ্ধান্তে সুন্দর, কিন্তু বৈবহারিক জগতে এর মূল্য নেই। এর চটকদার রঙ জোনাকির আলোর মতই, কিছুদিন পরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। আবার যেখানে ঋণাত্মক সম্বন্ধে তুমি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছ, কিন্তু সে সম্বন্ধেও যদি দেখ এটা বর্জন করাতেই 'সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায় লোক কল্যাণার্থম্' তাহলে সেটাকে স্থায়ীভাবে বর্জন করৰে ও বলৰে যে, আমার 'না'-টা পাকাপাকি 'না'। অন্যথায় যদি দেখ-না, এর যদি

উপযুক্ত কালচার করা হয় তাহলে এ জনকল্যাণে লাগলেও লাগতে পারে তখন বলতে হবে–আমার এই না-টা পাকাপাকি 'না' নয়, এটা এককালে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। অর্থাৎ যেটা 'কল্যাণার্থম্' লাগবে না সেই 'না'-টাই পাকাপাকি, 'কল্যাণার্থম্' লাগলেও লাগতে পারে সেই 'না'-টা পাকাপাকি নয়। সেটা পরবর্তীকালে হয়তো তুমি সমর্থন করবে আর শুধু সমর্থন নয়, তার প্রচারে প্রসারে মন-প্রাণ লাগিয়ে দেবে।

এই যে কল্যাণার্থম্ ফাইন্যাল ডিসক্রিমিনেশান যা ডেসিডারেটিক্ পয়েন্ট অব ডিসক্রিমিনেশন বা ফাইন্যাল আউটকাম্ অব ডিস- ক্রিমিনেশন-এই যে সদসদ্ বিচারের ফলশ্রুতি, একে বলি বিবেক- 'কনসায়েন্স'। জিও-সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুঝতে গেলে, নিজেকে বাঁচাতে গেলে, সমূহকে বাঁচাতে গেলে (নিজেকে বাঁচানোর চেয়ে বেশী দামী সমূহকে বাঁচানো) তুমি কী করবে?-না, প্রথমে ষ্টাডি করবে, ষ্টাডির ভুলভ্রান্তি দেখবার জন্যে তোমাকে কী করতে হবে?-না, ধনাত্মক-ঋণাত্মক বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। আর সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার পরে সেই সিদ্ধান্তটিকে বাস্তবায়িত করা হবে কি না-এটা কল্যাণার্থম্ কি কল্যাণার্থম্ নয়-এই বুঝে যখন চরম সিদ্ধান্তে (final decision) পৌঁছুচ্ছ ফাইন্যাল ডেসিডারেটিব পয়েন্টে

(desiderative point) পৌঁছুচ্ছ সেইটা হচ্ছে বিবেক (conscience)। এখন এই বিবেক দ্বারাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে জিও-সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে লড়তে হৰে। এই পৃথিবীতে অনেক লোক এসেছেন, তাঁরা নানান ধরণের চালাকির দ্বারা মানুষের মনে নানান ধরণের ডগমা ঢুকিয়ে দিয়েছেন ও নানান ভাবে মানুষকে শোষণ করে গেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যুঝতে হলে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনটা হচ্ছে বিবেক। আর বিবেকটা কী তা খুঁটিয়ে বললুম। তোমরা তোমাদের বিবেককে সৰ সময় জাগিয়ে রাখবে। লোকের মুখে শুণে বা বই পড়ে হাততালি দেবে না। কোন মানুষকে বা কোন থিওরীকে নিয়ে মাতামাতিও করবে না- মাথায় নিয়ে আদিখ্যেতাও করবে না। এইভাবেই জিও-সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে ষ্টাডিজ ও র‍্যাশন্যালিষ্টিক মেন্টালিটির দ্বারা যুঝতে হবে। এই যে ধনাত্মক- ঋণাত্মক বিচার দ্বিতীয় ধাপে, মানে ষ্টাডিজের পরের ধাপে ধনাত্মক- ঋণাত্মক বিচার ও তার পরের ধাপে সেটা ব্লিসফুল আর নন-ব্লিসফুল অক্সিলিয়ারী আর নন-অক্সিলিয়ারী-এই বিচারগুলো সম্পূর্ণ যখন হ'ল- লজিকের সাহায্যে, তখন বিবেক জাগল। যার বিবেক সদা জাগ্রত তাকেই আমরা বলৰ র‍্যাশন্যালিষ্টিক মেন্টালিটি। বিবেককে সদাজাগ্রত করে রাখ। র‍্যাশন্যালিস্টিক মেন্টালিটিকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোল। জিও-সেন্টিমেন্টের দ্বারা আর

কেউ তোমাদের ঠকাতে পারবে না, প্রবঞ্চনা করতে পারৰে না। আর এই যে গড়ে ওঠা র‍্যাশন্যালিষ্টিক মেন্টালিটি–এই মেন্টালিটি পরবর্তী স্তরে তোমাদের সোসিও সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে অথবা অর্ডিনারী বা জেনারেল হিউম্যানিষ্টিক সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে তথা স্যুডো হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজীর বিরুদ্ধে যুঝতে প্রেরণা দেবে–যুঝবার সামর্থ্য দেবে। কেবল কণ্ঠেই যে ৰল আসবে তা নয়, সামগ্রিকভাবেই তোমরা বলবান হবে।

(কলকাতা, ২৩শে মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

নোতুন প্রজন্মের পাথেয়

পরম কর্মায়ণ সত্তা (Supreme Functional Entity) একটা বিশেষ নিয়মে কাজ করে যায় আর তার এই নিয়মৰদ্ধতাকে

'নেচার' ৰলৰ। এই নিয়মৰদ্ধতা বেশ একটা সাধারণ ধারা (general stream) ধরে চলে। কিন্তু এই চলার পথে কোথাও কোথাও কিছুটা (যদিও তার মাত্রা বেশী নয়) অতিস্বাভাৰিকত্ব (abnormality) দেখা দেয়। এই এ্যাবনর্মালিটিটাও নেচারের বিধির (rule) বাইরে নয়। এটাও নেচারের একটা স্বীকৃত ব্যাপার অর্থাৎ এটাও নেচার। মেইন স্ট্রিম থেকে যে ডিবিয়েশন-সেই ডিবিয়েশনটা কেউ বলবে না 'ন্যাচারাল ল'-এর ডিবিয়েশন। এই ডিবিয়েশনটাও 'ন্যাচারাল ল'-এতে স্বীকৃত জিনিস। এখন সাধারণতঃ মানুষের বিচার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, মেধা-সেই মেইন স্ট্রিমটা ধরেই চলে। যে এ্যাৰনর্মালিটি অল্পস্বল্প দেখা দেয়-একটু আগেই ৰললুম-সেটাও নেচারের চলার পথে স্বাভাবিকতা-সে মেইন স্ট্রিম না হলেও সেটা স্বাভাবিক। এ্যাৰনর্মালিটি, আননন্যাচারালিটি মহাবিশ্বে (universe) নেই। অর্থাৎ সৰই স্বীকৃত। কিছুই আন-ন্যাচারালিটি বা এ্যাৰনর্মালিটি নয়। নেচার-এরই স্বীকৃত এক একটা কর্মায়ণ ধারা (functional faculty) ৰলতে পারি। এই যে বিশেষ ধরণের কর্মায়ণ ধারা-এ নেচারের আওতার মধ্যে, পরম কর্মায়ণ সত্তার অধিক্ষেত্রের ভেতরেই (Special type of functional faculty within the scope of nature, within the scope of Supreme Functional Principle)। এতে আমরা যে অভিব্যক্তিগুলো (expression) পাই-তা সে উদ্ভিদ সংরচনাতেই হোক, জীব

সংরচনাতেই অথবা মানুষের সংরচনাতেই হোক না কেন (both within plant structure, within animal structure and also human structure)। সেগুলো কী হয়?-না, কোন কোন ব্যাপারে সে মেইন স্ট্রিম থেকেও কম দ্রুতিশীল (less advancing), আবার কোন কোন ব্যাপারে অধিক দ্রুতিশীল (far more advancing)। আর এই ধরণের সংরচনার দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যখন কোন কল্যাণকর ঘটনা সংসাধিত (blissful activity) হয়ে যায় বা হয়, তাকে আমরা বলি প্রতিভাধর (genius) আর তাকে বলতে পারি একটি কল্যাণঘনসত্তা, একটি মানুষের আধারে মূর্তকল্যাণ, পশু সংরচনার খুবই ভালো জিনিস, উদ্ভিদ সংরচনায় মনে রাখার মত জিনিস (a blissful structure, bliss in human structure, good in animal structure and remark- able in plant structure) |

আবার কোন সংরচনা-সে যদি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়, তখন মানুষের আধারে পিশাচ, পশুর আধারে পশুর চেয়েও নীচ, সর্বনেশে উদ্ভিদের আধারে সর্বনেশে জিনিস (a demon in human structure, bad in animal structure, notorious in plant structure)। এখানে আমাদের বিশেষ করে উপজীব্য হ'ল ব্লিস ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার ও ডিমন ইন্ হিউম্যান

স্ট্রাকচার। দি ব্লিস ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার-তারা তাদের জিনিয়াসকে নবতর উদ্ভাবন-আবিষ্কার ইত্যাদিতে কাজে লাগিয়ে দেয়, মানুষের মানসিক-আধ্যাত্মিক উন্মেষ ঘটিয়ে দেয়। সব মানুষকে নিয়ে এক সঙ্গে চলে, লক্ষ্যের পানে দ্রুত পৌঁছুতে সাহায্য করে দেয়। তারা মানুষ সমাজের সম্পদ। তাদের ষ্টাডি করতে গেলে, জানতে গেলে খুব বেশী মনীষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যারা ডিমন্ ইন্ হিউম্যান স্ট্রাকচার তারা ছক্ বাঁধা নিয়মের মধ্যে আছে (They are in categorical form.)। যদিও এই ধরণের স্ট্রাকচারগুলো, এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো, এই সংরচনাগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে দেখতে মানুষেরই মত, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তারা অতি চালাক, অতি ধূর্ত (exceptionally clever and exceptionally cunning)। এরা বিভিন্ন ধরণের সেন্টিমেন্টের দ্বারা হাজার হাজার নয়-লাখ লাখ মানুষকে অকল্যাণের পথে ঠেলে দেয়- নিজেদের তুচ্ছ প্রতিষ্ঠার লোভে অথবা অন্য কোন লোভে। সাধারণ মানুষ অত তলিয়ে ভাবে না। কিভাবে তলিয়ে ভাবতে হয় তা শেখানোও হয়নি...হয় না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এই ধরণের বিজ্ঞান বা বিদ্যা কতকটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাই মানুষ তাদের সম্বন্ধে কিছু না বুঝেই তাদের নিয়ে মাতামাতি করে ফেলে, তাদের নিয়ে বড় বড় ৰই লিখে ফেলে, ও তাদের কথাকে বেদবাক্য জ্ঞান করে সমাজের

রাষ্ট্রের জনসমূহের বহু ক্ষতি করে ফেলে। তা সেই অজ্ঞ নিরীহ মানুষেরা বুঝতে পারে না যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা ওই সকল ব্যষ্টিদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই ধরণের মানুষেরা কী করে? তারা মানুষের অন্তর্নিহিত (innate) ছোট ছোট জিও-সেন্টিমেন্টকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেয়-দিয়ে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত চালাতে থাকে। কোন দেশের একজন নেতা দেশবাসীর মধ্যে জিও-সেন্টিমেন্টকে মনে কর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দিলেন। আবার জিও-সেন্টিমেন্টটা যেই বেড়ে গেল, তখন তাঁরা আবার ভয় পেয়ে যেতে পারেন যে এই যে জিও- সেন্টিমেন্ট এদের বাড়িয়ে দিলুম-জিও-সেন্টিমেন্টের সঙ্গে জিও- পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটাও বাড়িয়ে দিলুম-জিও-সেন্টিমেন্টটা ৰাড়ালে জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটিও বেড়ে যাৰে-জিনিসটা যে সেখানেই থেমে থাকবে এমন তো কোন কথা নয়। জিও-ইকনমিক সেন্টিমেন্টও তো জাগতে পারে। তারা তো ভাবতে পারে যে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলুম আর সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছে তাদের মনে জেগে যায় তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ হবে। আমরা চাইছি কেবল জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগিয়ে একটা জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন মানুষকে দিতে। কিন্তু জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন পাবার আগেই জিও-পলিটিক্যাল লিবারেশন পাবার

কথা ভাবতে ভাবতেই যদি তাদের মনের মধ্যে জিও-ইকনমিক লিবারেশন পাবার স্বাদ জেগে যায় তাহলে তো মহা ফ্যাসাদ হৰে। এই নিরন্ন দেশে, বস্ত্রহীন দেশে সবাইকে যদি পেট ভরে ভাত ডাল খেতে দিতে হয়, আমাদের মত পেট ভরে আখরোটের তেল আর অমুক তমুক যদি নাই বা জুটল-পেট ভরে যদি ডাল-ভাতও খেতে দিতে হয়–তাহলে সেটা তো চাট্টিখানি কথা হবে না। তাহলে তো বর্তমান যে ষ্ট্রাক্টারটা রয়েছে, যে শোষণমূলক সংরচনা (exploitative structure)-সেটাকে তো বদলাতে হবে। আর তা যদি করতে হয় তাহলে পলিটিক্যাল লিবারেশনটা পেয়ে লাভ কী হবে! এই রকমের তলিয়ে তারা ভাবতে পারে। আর সাধারণ মানুষেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না। তলিয়ে ভাবতে গিয়ে এই ধরণের মানুষেরা এটাও দেখৰে যে তার চাইতে ভাল হয় যে জিও-পলিটিক্যাল সেন্টিমেন্টটা খুৰ ৰেশী ৰাড়বার আগেই যদি এর একটা নিষ্পত্তি করা যায় অর্থাৎ পলিটিক্যাল লিবারেশন যার হাত থেকে পাৰার কথা তার সঙ্গে মিলে মিশে গোপনে শলা পরামর্শ করে যদি শান্তিপূর্ণ ভাবে এই ক্ষমতাটা হস্তান্তর করে নেওয়া যায়। কারণ শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গেলে লড়বার জন্যে সেন্টিমেন্টের যে চরম অবস্থা সেটার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে আমাদের হাতেই ক্ষমতা এসে যাবে। আর

ক্ষমতা এসে গেলে আগে যেমন শোষণ ও শোষণকারী যন্ত্র (exploitative machinery) চলছিল আমরা সেইটাই ৰজায় রেখে দেব-কেবল শাদার বদলে কালো মানুষেরা শাসন করৰে, এছাড়া কোন তফাৎ হবে না। আর সাধারণ মানুষকে বলব, "আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি" (We have attained political liberty.)। এই বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দোৰ-তাদের কথাগুলো ধামাচাপা দিয়ে দোৰ। ৰলৰ, "না-না, এসব কথা বলতে নেই, এসব কথা ৰলতে নেই, বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব কথা বলা পাপ।"

এই যে বর্ণচোরা মাণিকেরা, বাইরে থেকে এদের চেনা যাচ্ছে না কিন্তু তলে তলে কি সাংঘাতিক! এরা হ'ল ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ক। এখন কালের নিয়ম হচ্ছে যে বেশী দিন কোন সত্য ধামাচাপা থাকে না। সে ফুটে বেরিয়েই যাবে। এমন পাপীদের মুখ থেকেই অনেক সময় পরোক্ষে বেরিয়ে যায়। কারণ মানুষের একটা সাইকলজি হচ্ছে যে জিনিসটা সে ধামাচাপা দিতে চায়, ৰলৰ না বলৰ না ৰলৰ না করে, অতর্ক মুহূর্তে সেটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোন লোক কোন জিনিসটা হয়তো খুৰ চেপে রেখেছে। তারপরে এক বোতল কারণবারি পান করার পরে -মাতাল অবস্থাতে সে সব বলে দেবে। আমার জানা কোন

একটি ধর্মসম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন। তিনি এমনিতে কিছু বলতেন না; আর অস্বাভাবিক অবস্থায় (তিনি যে সম্প্রদায়ের সে সম্প্রদায় মূর্তিপূজো আর জাতিভেদের বিরোধিতা করে কিন্তু যজ্ঞ-টজ্ঞ করে) অর্থাৎ খুব কারণৰারি পানি করে বলছেন-(আমার চোখের সামনেকার ব্যাপার) "মেঁ তো কহতা হুঁ কী মৈঁ জাতপাত নহী মানতা হুঁ-মগর মৈঁ মেরে ৰেটো কা বেটিয়ো কা বিবাহ কায়স্থ মে করুঙ্গা। মৈঁ তো দেবী দেবতা নহী মানতা হুঁ-লেকিন বেটী কী সাদী নহী হো রহী হ্যায়। ইসলিয়ে লুপকে সত্যনারায়ণ ভগবান কী পূজা করতা হুঁ।” মদ খেয়েছে, তাই, তার মনের কথা সৰ বেরিয়ে গেল! তা অতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে যায়; সত্য কখনও চাপা থাকে না। তাই তাদের ব্যাপারটা তারাও বলে ফেলে। তা এইজন্যে তাদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের আমি বর্ণচোরা মাণিক বলেছি তাদের সম্বন্ধে বলেছি কী করতে হয়! তাদের সেজন্যে ধরা পড়ার আগেই একটা অন্য ধরণের পন্থা নিতে হয়। তাদের কী করতে হয়?- না, যে ধরণের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করছিল সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা সেন্টিমেন্টে সুইচওভার করতে হয়। আর এই সুইচওভার করতে গেলে একটুখানি চালাকির দরকার হয় সেটা বোঝাচ্ছি।

এই যে সুইচিং ওভার এটাকে বলা হয় metamorphosed senti- mental strategy। অর্থাৎ যে সেন্টিমেন্টাল স্ট্র্যাটেজী নিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলুম আজ দেখছি ধরা পড়ে যাচ্ছে আমার সেই স্ট্রাটেজী-লোকে জেনে ফেলেছে আমার স্বরূপটা। এখন আমার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে গেলে কী করতে হবে?-না, অন্য একটা সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করতে হবে ও সেটা করতে হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে-দেরী হলেই সেই ফাঁকে প্রতিষ্ঠাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তা এই যে সুইচওভার করা একটা সেন্টিমেন্ট থেকে আরেকটা সেন্টিমেন্ট- কম্যুন্যালিজম্ থেকে ন্যাশন্যালিজমে চলে গেল অথবা ন্যাশন্যালিজম থেকে কম্যুনিজমে চলে গেল-এই এক একটা সেন্টিমেন্ট বদলে বদলে দেওয়া, সেন্টিমেন্টের এই যে মেটামোরফসিস এটাকে বলি মেটামোরফ সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী। এই ধরণের লোকেরা এসবেও ওস্তাদ। কোন একটা পার্টি-সে আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-যাই হোক না কেন (এ তো সাইকলজির ব্যাপার হচ্ছে) দেখছে তাতে দলাদলি হয়ে যাচ্ছে, দু'দলে চার দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আবার আলাদা সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাচ্ছে ওই দলগুলো। তখন চালাক মানুষেরা কী করে?-না দেখে এর মধ্যে কোন দলটা বেশ ভারী, দলে ভারী কারা। সেই দলে ভিড়লে আমার প্রতিষ্ঠাটা ঠিক থাকৰে। সে তাড়াতাড়ি করে কী?-না

বাকীগুলোর বিরুদ্ধে যে দলটায় গেলে তার প্রতিষ্ঠা বজায় থাকৰে তার পক্ষে বিবৃতি দিয়ে দেবে, ভাষণ করে দেবে, ষ্টেটমেন্ট দিয়ে দেবে, গরমাগরম কথা ৰলৰে, অথবা এমনও বলে ফেলৰে "একদিন আমি ভুল করেছিলুম- আমি ভুল করেছিলুম” বলে তাড়াতাড়ি সুইচ ওভার করে নেবে-নিয়ে আবার প্রতিষ্ঠাটা ৰজায় রাখবে। তোমরা সোসিও-ইকনমিকো-পলিটিকো-কালচারাল-সমস্ত লাইনেই এই ধরণের মানুষকে দেখতে পাবে। এরা এইরকম ভাবে সেন্টিমেন্ট এক্সপ্লয়েট করে মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে, গৌণতঃ অন্যান্য লাভের ব্যাপারও আছে। আর এই ব্যাপারে এরা মানুষের কল্যাণ তো মোটেই চায় না। এরা মানুষকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে দেখে, "আচ্ছা এই এক লাখ লোেক, এই দু'লাখ লোক এদিকে থাকবে–এই পাঁচলাখ লোককে এই ভাবে কাজে লাগাব। এইভাবে তারা ভাবে আর যারা তাদের বিশ্বাস করেছিল তাদের একদিন কী হয়?-না, সর্বস্ব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হয়, অপমান, নিপীড়নের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, পথে ঘাটে শিয়াল কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়। কাদের জন্যে! এই সমস্যার জন্যে দায়ী সেই সকল ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ক তাদের জন্যে। যাদের ওপর এরা বিশ্বাস করেছিল, যাদের মিটিং-এ হাজার হাজার মালা নিয়ে যেত, যাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে বিশেষ ধরণের টুপি পরে নিজের পাপকে ঢাকবার চেষ্টা করত।

একজন ভদ্রলোককে আমি বললুম, "তুমি এই ধরণের টুপি কেন পর! কালো চুলেতে শাদা রঙের বেশ খোলতাই হবে-তাই না?" সে বললে, "যা ভাবছেন তা নয়, আমি পাপ ঢাকবার জন্য টুপি পরিনি-পরেছি টাক ঢাকবার জন্যে"। অনেকে এই টাক ঢাকবার জন্যে পরে আর অনেকে আনুগত্যের অভিপ্রকাশ হিসেবেও পরে। কিন্তু সেই উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় ও এইভাবে পথে ঘুরে বেড়ানো মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজ হাজার হাজার, লাখ লাখ নয়-কোটি কোটি রয়েছে। আর এই যে কোটি কোটি মানুষ যারা অযত্নে ক্ষুধার তাড়নায় মরছে, শেয়াল-কুকুরেরও অধম তারা মরছে। এই মরার জন্যে দায়ী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ক। তারা পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর বিরাট রকমের সর্বনাশ করে দিয়ে চলে যায়। তাদের জীবিত কালে তারা প্রচার-মাধ্যম (mass media) গুলোকে পুরো কাজে লাগায়। তাইতে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়–তারা তার ঊর্ধ্বে ভাবতে পারে না। সাধারণ মানুষের দুর্বলতা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে তারা যা দেখে সেইটাই সত্য বলে মনে করে। সেই ডিমনরা কিন্তু ভাবতে পারে না যে তারা পৃথিবী থেকে চলে যাবার পরেই আসল হিসেবনিকেশ হয়, তখন মানুষ ভাবে, "এ কী করেছিলুম! শিব ভেবে বাঁদরকে পূজো করেছিলুম-এ কী নিজেদের সর্বনাশ

করেছিলুম!” কিন্তু তখন আর শোধরাবার পথ থাকে না। জনগোষ্ঠী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মানুষে মানুষে মনের মাঝখানে বড় বড় প্রাচীর তৈরী হয়ে যায়, মানুষ জাতের সামগ্রিক অকল্যাণ সাধিত হয়ে যায়। এই ধরণের মানুষ-আমি আগে ৰলেছি, আবার বলছি-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আছে। কেউ কেউ ভাবে যে কেবল পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে থাকে তা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকে। বিশেষ করে চিন্তার জগতের বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক অভিপ্রকাশ (in the field of so many schools of thought)-এটা আরও বেশী, এতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার অপচেষ্টা খুব বেশী আছে। অতীতে অনেক দার্শনিক গোড়ার দিকে এক রকম কথা বলেছেন, তার পরে দেখেছেন, স্পষ্ট কথা ৰললে সমর্থন পাব না তখন ভোল পাল্টেছেন। নাম কারো করা উচিত নয়। তোমাদের হাতে মাপকাঠি, তোমাদের হাতে কষ্টিপাথর, তোমরা যাচাই করে দেখতে পারৰে। কেবল একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে-মহর্ষি কপিল গোড়ার দিকে একেবারেই ঈশ্বরের কথা বললেন না। তাঁর সাংখ্যের নাম নিরীশ্বর সাংখ্য। যখন দেখলেন হালে পানি পাচ্ছি না; অর্থাৎ লোকে এ দর্শন ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন 'জন্য ঈশ্বরের’ উদ্ভাবন করে ঘুরে ফিরে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিলেন। শাঙ্কর দর্শনের সৰ কিছু মায়া; অর্থাৎ সব কিছুর

গোড়ায় মিথ্যা, মাঝে মিথ্যা শেষে মিথ্যা-যাকে বলে প্রমাদ। অথচ তিনি কী করলেন? -না, গঙ্গার স্তোত্র রচনা করলেন, বললেন 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।' বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যে। সেই মিথ্যা বিশ্বে গঙ্গাটাও তো মিথ্যে। তাহলে তার স্তুতি গাইবার কী প্রয়োজন ছিল! এগুলো হচ্ছে কী? না, হালে পানি না পাওয়ার ফলে ভোল পাল্টাবার চেষ্টা, খোলস পালটে ঢোড়া-ঢেমনা সাজবার চেষ্টা। এটাকে কী বলছি?-না, মেটামোরফড্ সেন্টিমেন্টাল স্ট্র্যাটেজী।

এই যে ভোল পাল্টানো অথবা এই যে সেন্টিমেন্টাল স্ট্র্যাটেজী-এটা পরিবর্তন। অনেকে বলবেন, এটা বিবর্তন। কিন্তু বিবর্তন নয়–পরিবর্তন। বিবর্তন অত কম সময়ে ঘটে না, বা অত অল্পায়াসে সংসাধিত হয় না। এখন, মানুষ জাতের যাঁরা ক্ষতি করেছেন তাঁদের অনেক প্রকৃতি। আর তাঁদের সবাইকেই মোটামুটি তোমরা বুঝেই নিয়েছ। এই যে বর্ণচোরা মাণিকেরা যারা সেন্টিমেন্ট বদলে দেয় মানুষকে অধিকতর শোষণ করবার উদ্দেশ্যে তাদের চেনা একটু শক্ত। এরা কখনও একটা জিও-সেন্টিমেন্ট থেকে আরেকটা জিও-সেন্টিমেন্টে সুইচওভার করে যায়, আবার কখনও জিও-সেন্টিমেন্ট থেকে অন্য কোন সোসিও-সেন্টিমেন্টে সুইচওভার করে যায়। অথবা একটা সোসিও থেকে

আরেকটা সোসিওতেও চলে যায়। এরা সৰ পারে। জনসাধারণকে হাতে নেবার জন্যে হয়তো কোনদিন কোন একটা নেতা-কোন একটা দেশের নেতা বললে যে আমার দেশকে কিছুতেই আমি ভাগ হতে দোব না-বিভক্ত হতে দোব না; আমার মৃতদেহের ওপর দেশের বিভাজন হবে-তৎপূর্বে নয়। কী করলে না, একই সঙ্গে মানুষের জিও-সেন্টিমেন্ট তথা সোসিও-সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করলে। সবাই হাততালি দিয়ে বললে, "উনিই আমাদের একমাত্র ভরসা! সাধে ৰলি উনি নির্ঘাত ব্রহ্মা, নিদেনপক্ষে বিষ্ণুর অবতার!" তারপরে সেই দেশটা মনে কর বিভাজিত হ'ল। তখন সেই নেতা গোড়ার দিকে কিছুই বললেন না। তাঁর তখন মৌন দিবস চলতে থাকল। তারপরে বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পরে বললেন, "আমি এতে বড় দুঃখিত, আমি জনগণের সঙ্গে আছি।" এগুলো হ'ল কী?-না, মেটামোরফ সেন্টিমেন্টাল স্ট্রাটেজী, এদের চিনতে হবে। এখন এদের চিনতে গেলে কী করতে হবে! সাধারণ বুদ্ধিতে হয় না, একটু বেশী বুদ্ধির দরকার হয়। এইজন্যে প্রয়োজনটা হচ্ছে কী! যে এদের চিনতে যাবে প্রথমতঃ তার মনটা উপযুক্তভাবে তৈরী হতে হবে। আর মনটা তৈরী হবার জন্যে একটা আধারশিলা (base) চাই। কয়েকটা ছেলে দৌড়োতে চায়, দৌড়োতে গেলে তাদের একটা মাঠের উপর দাঁড়াতে হবে তো। তেমনি মনকে তৈরী করতে

গেলে একটা আধার শিলার দরকার। এই আধারটা হচ্ছে সমসমাজ তত্ত্ব। অর্থাৎ অন্যে যে যাই বলুক না কেন আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে সকল মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান ইত্যাদি প্রাপ্তির ষোল আনা অধিকার আছে। আমি সেই অধিকারটা শুধু যে স্বীকারই করলুম বা করছি তাই নয়, তারা যাতে এই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, একটা সৎ মানুষ হিসেবে আমি সেজন্যে চেষ্টাশীল থাকৰ। এইটাই হ'ল যথার্থ আইডিয়া-সমসমাজতত্ত্বের স্পিরিট। আর এইখানে থেমে থাকলে-স্পিরিটটুকুকে নিয়েই যদি থেমে থাকি, তাহলে কাজ হবে না। যে ছেলেগুলো দৌড়োতে চায় তারা একটা মজবুত মাটির ওপর দাঁড়ালেই কি আর দৌড়োনো হ'ল! তাদের দৌড়োতেও তো হবে। এই যে দৌড়ুনোটা-এই যে এগিয়ে চলাটা এটা হ'ল কি প্রোটো-সাইকো- স্পিরিচ্যুয়ালিটি। এই প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটির মাধ্যমে হয় কী! মানুষ যে ধরণের ভাবছে, অন্যের কর্মে যদি দেখে সেই ধরণের ভাবনার অভাব হচ্ছে, সে তাদের চিনে ফেলে। সুতরাং এই অবস্থায় মানুষ এই প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি-এর দ্বারা ওই সকল ডিমন ইন হিউম্যান ফ্রেমওয়ার্ককে চিনে ফেলে। আর, চিনে ফেলার পরে তাদের উচিত জনগণকে ভালভাবে চিনিয়ে দেওয়া যে দেখ অমুক এইভাবে বিশ্বমানবের অকল্যাণ করে চলেছে। তাই কেবল যে নিজেই চিনে ফেললুম

সেটাই যথেষ্ট নয়, অন্যের চোখ খুলে দিতে হবে তবেই না জগতের কল্যাণ হৰে। তাই চুপটি করে ঘরে ভাল মানুষটি সেজে ঘাপটি মেরে পায়রার খোপের মধ্যে যদি ৰসে থাকে তাহলে কাজ হবে না। তাকে ডানা মেলে উড়তে হৰে নীল আকাশে। তা এই যে প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি- এটা একটা চলমান সত্তা। যেমন মাঠে কতকগুলো ছেলে দৌড়োচ্ছে- এই চলমানতা হ'ল এর প্রাণ। এরা যদি চলমানতা খুইয়ে মাঠে বসে থাকে, সেটা যেমন দৌড়ানো তো হ'লই না, তার ফলে আলস্য উৎসাহিত হ'ল-It will encourage the psychology of lethargy, তা এ জিনিসটা কী রকমের-কেমন?

এই যে আমদের মহাবিশ্ব তোমরা জান এটা সারকামরোটারিয়ান (This universe of ours, you know, is circumrotarian.) অর্থাৎ এ নিজের কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বেই ঘূর্ণায়মান। এর বাইরে কেউ নেই। সুতরাং একে বাইরে থেকে কোন সেন্টার বা কেন্দ্র খুঁজতে হবে না-কোন নেইব, কোন হাৰ, কোন চক্রনাভির খোঁজে ছোটাছুটি করতে হবে না। মহাবিশ্বের চক্রনাভি সেই ব্যষ্টিরও চক্রনাভি-The Hub of this circumrotarian universe is his hub also। এখন এই যে সারকামরোটারিয়ান ইউনিবার্স-এ সামগ্রিকভাবে আবার

ইউনিটারি ভিত্তিতেও একটা সেন্টার থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই প্রতিটি পার্টিকল, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি স্তম্ব সবই সেই সুপ্রীম হার্ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে (Each and every grain of dust, each and every blade of grass-all are being equally controlled by that Supreme Hub.)। এখন কোন মানুষ যদি ইউনিট হার্কে, ইউনিট সাইকো- স্পিরিচ্যুয়াল হার্কে এই সারকামরোটারিয়ান স্পিরিচ্যুয়াল হাবের সঙ্গে কোয়েনসাইড করিয়ে দিতে পারে, তাহলে প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে, প্রতিটি স্তম্বের সঙ্গে (স্তম্ব মানে ঘাসের পাতা) সে তার আত্মীয়তা অনুভব করৰে-মর্মে মর্মে অনুভব করবে (Each and every grain of dust, each and every blade of grass will be his psychology- that will be his say.) আর এই অনুভূতিটাই তাকে বিশ্বগতপ্রাণ করে দেবে ও এই বিশ্বগতপ্রাণ হবার ফলে অর্থাৎ এই প্রোটো-সাইকো- স্পিরিচ্যুয়ালিটির ফলে সে তখন যত রকমের সোসিও-সেন্টিমেন্ট আছে তার বিরুদ্ধে যুঝতে পারবে। এই বর্ণচোরা মাণিকেরা-তারাও তো সোসিও-সেন্টিমেন্টকে বা জিও-সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগায়। সুতরাং তাদেরও ভালোভাবে চিনে ফেলতে পারবে। এখন তোমরা বলতে পার এটার নাম আমি প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি কেন রাখলুম।

সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি জিনিসটা হ'ল কি, না, মন এগিয়ে চলেছে স্পিরিচ্যুয়ালিটির দিকে-তাই সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি নামটা যথার্থ হ'ল। এখন প্রোটো এই কারণে বলছি যে এটাও একটা ফ্লিকারিং এন্টিটি (flick- ering entity)-নির্বাত দীপশিখার মত নয়, দপদপ্ করা দীপশিখার মত। অর্থাৎ এটা কোন নির্বাত নিশ্চল অবস্থা নয়-একটা চলমানতার দ্যোতক। তাই কমপ্লিট সাইকো স্পিরিচ্যুয়ালিটি বলতে পারলুম না- ৰলছি প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি। আর এই যে প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়ালিটি-এর মধ্যে যে সিস্টালশন রয়েছে, এই সিস্টালশনের ভেতরে যে মোবিলিটি পোরশন-সেই মোৰিলিটি পোরশানটা হল পিওরলি সাইকিক্। আর এরই মধ্যে যে ব্লিসফুল ষ্ট্যাটিসিটি রয়েছে- সেটা হল পিওরলি স্পিরিচ্যুয়াল–that is a happy blending of psychic and spiritual strata। তাই জন্যে এটাকে বলছি সাইকো- স্পিরিচ্যুয়ালিটি। এখন এতে আরও একটা বক্তব্য রয়েছে। যখনই মানুষ কোন কাজ করৰার পরে সেই হার্', সারকামরাটেরিয়ান ইউনিবার্সের' সেই 'নেইব' এর কথা ভাববে-তৎকালের জন্যে তার মনটাও হয়ে যাৰে সর্বানুস্যূত-সে কারো ক্ষতির কথা ভাববে না–সে সবাইকার কল্যাণের কথা ভাবৰে। আর যে ক্ষতিকারী ইউনিট যে মানবাধারে দৈত্য তাদের সে ভালোভাবেই চিনে ফেলবে। আর

অন্য সব রকমের সোসিও- সেন্টিমেন্ট যাদের দ্বারা প্রেষিত হয়ে সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষ, ব্যষ্টি, ব্যষ্টি-সমষ্টি ভুল পথে পরিচালিত হয়, তাদের শুধরে দেবারও যোগ্যতা অর্জন করবে। কারণ জিও-সেন্টিমেন্টের চেয়ে সোসিও- সেন্টিমেন্ট অনেকগুণ বেশী ক্ষতিকর। তাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত ভালোভাবে জেনে বুঝে সেমিনারের মাধ্যমে এই সোসিও-সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুঝতে হলে যে সমসমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রোটো-সাইকো-স্পিরিচুয়াল মুবমেন্ট অর্থাৎ গতিশীলতা দরকার, এই দুটোকে জেনে, দুটোকে অনুসরণ করে মানুষের মুক্তির পথ দেখাবে। এটা করতেই হবে, আর কেন করতে হবে?-না ব্যষ্টিগত জীবনে অনেক মানুষ হয়তো জেনে অথবা না জেনে এটা করে থাকেন কিন্তু সমষ্টি তো অন্ধকারে পড়েই রযেছে তাই সমষ্টিকে সঙ্গে টেনে নিয়ে 'সমষ্টি তোমারই', 'সমষ্টি তোমার ৰাইরেকার নয়,' 'সৰাইকার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য অচ্ছেদ্যভাবে সংরচিত', সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে এই তামসী বিভাবরীর পরপারে নোতুন প্রভাতের মধুঢালা আলোর দিকে নিয়ে যেতে হবে।

(কলকাতা, ২৮শে মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র

নব্যমানবতাবাদই শেষ আশ্রয়

আজকের মানুষ মনীষায় বৈদগ্ধ্যে বিবেচনায় বিচারে কিছুটা তো এগিয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল আজ থেকে আনুমানিক দশ লাখ বছর আগে। সেই সময়কার মানুষের বিভিন্ন অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাতাশা-উদ্বেগ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যেমনটি ছিল আজও তেমনটিই আছে। তফাতের মধ্যে আজকের মানুষের মধ্যে এসেছে অনুভূতির আরও বেশী গভীরতা। গভীরতা শুধু নয়, এই গভীরতার সঙ্গে চিন্তার মৌলিকত্বও বেড়ে গেছে। মানুষের এই যে গুণের ও দোষের সমষ্টি (collection of all perfections and imperfections of human beings)-এর সৰটাকে নিয়েই 'হিউম্যানিজ্ম্' আর মহত্তর ভাবগুলো যেখানে একীকৃত হয়েছে, সমাহিত হয়েছে–সেইগুলো নিয়েই হচ্ছে হিউম্যানিজম্-একটা গোটা মানুষ....গোটা মানুষদের সমাহার। দোষেগুণে এই যে মানুষ- একে বর্তমান ইংরেজীতে বিশেষ্যেও 'হিউম্যান' (human) শব্দ ব্যবহার করা হয়-বিশেষণেও হয়। আগেকার দিনের যে মানুষ সংক্রান্ত ভাবসমূহ তার সম্বন্ধে যদি

'হিউম্যানিম্' শব্দটা ব্যবহার করি, আর আজকের দিনেও যদি সেই-ই 'হিউম্যানিম্' শব্দটা ব্যবহার করি তাতে ক্ষতিটা কী? মানবতা বা মানবিকতা আগেকার মানুষের সম্বন্ধে যেমনটি ব্যবহার করেছি, আজ কি তেমনটি ব্যবহার করতে পারি না! পারলেও পারতে পারি, কিন্তু তবু করছি না। কারণ, হিউম্যানিটি-কে হিউম্যানিম্-কে সেকালের মানুষ খুৰ ভালোভাবে বোঝেনি, স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। সে যুগে মানবতা বা মানবিকতা যথার্থভাবে বিশ্লিষ্ট হয়নি। আজও হচ্ছে না। এই দশ লাখ বৎসরের মানুষের ইতিহাসে মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। মানুষের একটি শ্রেণী, একটি বর্গের প্রতি বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, বেশী আদিখ্যেতা করা হয়েছে, ও তা করতে গিয়ে অন্যকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। একজন মানুষ লড়াই করল, মরল, আত্মদান দিল, কাগজে বড় করে তা ছেপে দেওয়া হ'ল, আর সে মরে যাওয়ার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে তার বিধবা স্ত্রীকে কী ধরণের অসুবিধায় পড়তে হ'ল সেকথা খবরের কাগজে বড় করে ছাপানো হ'ল না। অর্থাৎ, এক তরফা বিচার করে আসা হয়েছে। যদিও ব্যাকরণগত ব্যাপার, আর হঠাৎ বদলানো যায় না, তবু 'ম্যান' '(man)' এই কমন জেণ্ডারের মধ্যে 'ম্যান', আর 'ওম্যান' (woman)-দুই-ই এসে যায়। অথচ, ওম্যান, এই কমন জেণ্ডারের

মধ্যে 'ম্যান' ও 'ওম্যান' দুই-ই আসবেনা কেন। অর্থাৎ একতরফা, একপেশে বিচার করা হয়েছিল। **Man is a masculine gender, man is a common gender also-** মানুষ বলতে পুংলিঙ্গও হ'ল, আবার উভলিঙ্গও হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ৰলতে এখানে মেয়ে মানুষও। তা' এই ত্রুটিপূর্ণ জীবনের বোঝা নিয়ে দশ লাখ বছর ধরে মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এসেছে সবাইকার প্রতি সুবিচার করেনি। তাই মানুষের সম্বন্ধে-মানুষ সম্বন্ধীয় ভাব নিয়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনে যে 'মানবতা' আর মানুষ সম্বন্ধে মানুষ কৃত এই অর্থে 'ষ্কিক্' প্রত্যয় করে 'মানবিক' শব্দের উত্তর এ্যাৰষ্ট্রাক্ট নাউনে 'তা' যোগ করে যে 'মানবিকতা' এর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কিন্তু এই যে মর্যাদাভ্রষ্ট মানবতা, এই যে মর্যাদাভ্রষ্ট মানবিকতা (downtrodden humanity or downtrodden humanism)-একে নোতুন করে তাকিয়ে দেখবার সময় এসেছে। এমন দিন গেছে যে মানুষটা পেছিয়ে পড়েছে, মানুষটা মুখ থুৰড়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেছে, হাত-পা থেঁৎলে গেছে, মানুষটার বস্ত্রে কাদার ছাপ লেগেছে, অন্যে তাকে ঘৃণা করে দূরে ফেলে রেখেছে, সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, একঘরে করেছে.....এই সবগুলোই করেছে। যে পেছিয়ে পড়েছে তাকে টেনে তুলতে সঙ্গে নিয়ে যেতে ততটা প্রয়াস করেনি, ততটা চেষ্টা দেখায়নি। মানুষ চলতে শুরু করেছে যখন, নিজের কথাটা যতটা ভেবেছে, অন্যের কথাটা ততটা ভাবেনি। অন্য মানুষের

কথাও ভাবেনি, আর মনুষ্যেতর জীবজন্তুর কথাও ভাবেনি, গাছপালার কথাও ভাবেনি। অথচ একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখা যাবে কি যে নিজের কাছে নিজের অস্তিত্ব যতটা প্রিয়, প্রত্যেকের কাছে তাদের নিজের নিজের অস্তিত্ব ততটাই প্রিয়। আর সব জীবের এই নিজ অস্তিত্বপ্রিয়তাকে যথাযোগ্য মূল্য না দিলে সামগ্রিকভাবে মানবিকতার বিকাশ অসম্ভব। মানুষ যদি ব্যষ্টি বা পরিবার, জাত বা গোষ্ঠীর কথা ভাবল, সামগ্রিকভাবে মানুষের কথা না ভাবল, সেটা অবশ্যই ক্ষতিকর। কিন্তু মানুষ যদি সামগ্রিকভাবে জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগতের কথা না ভাবল সেটা কি ক্ষতিকর নয়! তা আজ এই মানবিকতাকে ও মানবতাকে নোতুন ভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর এই নোতুনভাবে ব্যাখ্যাত মানবিকতা জগতে সত্যিকারের সম্পদে পরিণত হবে। What is neohumanism? Neohumanism is humanism of the past, humanism of the present and humanism newly-explained of the future. মানবিকতাকে ও মানবতাকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যাত করে মানুষের চলার পথকে আরও প্রসারিত, আরও উন্মুক্ত, আরও সহজ সরল করে দেবে.....এই নব্যমানবতাবাদ। মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নোতুনভাবে বোঝাবে যে বিশ্বে এই সৃষ্টির মাঝখানে, এই সৃষ্ট জগতে তুমি সৰ চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, সৰচেয়ে বেশী চিন্তাশীল প্রাণী। তাই সমস্ত সৃষ্ট জগতে

অভিভাবকত্বের মহান দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তো, What is neohumanism? Humanism newly explained...newly sermonised is neohumanism. যে দর্শন মানুষকে বোঝাৰে তুমি তুচ্ছ নও, আর এই যে নিজেকে তুচ্ছতামুক্ত, গ্লানিমুক্ত করবার দর্শন- এ মানুষকে নোতুনভাবে প্রেরণা দেবে, মানুষ আবার নোতুনভাবে বিশ্বকে গড়ে তুলবে। আমি আগেই বলেছি যে (বিকৃত মানবতা) 'ডিষ্টর্টেড হিউম্যানিজম্' পৃথিবীর অনেক অনর্থ করেছিল, আজও করছে, আর নব্যমানবতাবাদের দ্বারা বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যতেও মানুষের কপালে অনেক দুর্দৈবের এরাই কারণ হবে। এরা মানে কারা? -না, যারা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্র্যাটেজীর দ্বারা প্রেষিত; এই যারা হিউম্যানিটিকে নিওহিউম্যানিজমের দিকে না নিয়ে গিয়ে একে ব্যষ্টিস্বার্থে লাগাচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, গোষ্ঠীস্বার্থে লাগাচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাদের সম্বন্ধে কী করণীয়? এই যে বিকৃত মানবিকতা বললুম অর্থাৎ এই হিউম্যানিটিকে, হিউম্যানিজকে নিওহিউম্যানিজমের দিকে নিয়ে গিয়ে, We may create a new panacea for all psycho-spiritual ailments. আর তা না করে তাকে যদি বিকৃত করা হয়, তাকে যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্র্যাটেজীর খাতে প্রবাহিত করা হয় তাহলে মানুষের সামাজিক দিক অর্থাৎ সোস্যাল লাইফে, ইকনমিক

লাইফ, পলিটিক্যাল লাইফে, কালচারাল লাইফে তো অবশ্যই, আর তার সঙ্গে ধর্মজগতে কী হবে! নানান বিকৃতি দেখা দেৰে, নানান ত্রুটি দেখা দেবে যে ত্রুটি মানুষের মনকে কলুষিত করে মানুষকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাবে। এই সম্বন্ধে.... ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। এখন প্যানাসিয়াটা (অনুপানভেদে সর্বরোগবিদূরক মকরধ্বজ) সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। যারা এই ডিস্ট্রসন ঘটায় হিউম্যানিটিতে, নিউহিউম্যানিজমের দিকে না নিয়ে গিয়ে এর মধ্যে বিকৃতি এনে দেয়, ডিস্ট্রসন এনে দেয়, তারাও সাধারণতঃ দু' ধরণের মানুষ। এক ধরণের মানুষ এই কাজগুলো করছে সম্পূর্ণ না জেনে। তারা জানেই না তারা কী দারুণ ক্ষতি করে চলেছে মানব সমাজের তথা মানবাশ্রিত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের। আর এক শ্রেণী আছে যারা জেনেশুণে স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে চলেছে, যাদের সম্বন্ধে আমি ৰলছিলুম যেন বর্ণচোরা মাণিক, ঘন ঘন রঙ পাল্টাতেও জানে। এই দু'ধরণের। নিওহিউম্যানিজমের যে সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল আসপেক্ট বা ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল এদের কাণে যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারা যায়। এক ধরণের হ'লঃ তারা বললে-'আহা, কী ভুলটা করেছি! কী ভুলটা করেছি! অমুক লোকটাকে নিয়ে আদিখ্যেতা করে কতই

রচনাসম্ভার (article) লিখেছি। আজ থেকে শুধরে যাৰ। অমুক লোকটার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দেখবার সামর্থ্য আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাই দেখতে পাইনি। আজ দেখতে পেলুম। এবার থেকে যথাযথ পথে চলে মানুষের কল্যাণ করৰ।' আবার ওদেরই আরেক শ্রেণী না জেনে করেছিল। তারা যখন ঠিক জিনিসটা জানলে, তাদের মধ্যে যদি 'ইগো'-র (অহম্মন্যতা) মাত্রাধিক্য থাকে, তাহলে বলবে, (স্বগত) দ্যাখ, আমি ভুল করেছি আর অমুক ধরিয়ে দিল! এ অপমান, এ অপমান! এ সহ্য করতে পারব না। অমুক যখন ৰলছে ঠিক জিনিসই তৰু মেনে নেওয়া আমার পক্ষে মর্যাদাহানিকর হবে। তা আমার পক্ষে যখন মর্যাদাহানিকর হবে, তখন যে ভুল পথে চলেছিলুম, সেই পথেই চলৰ। আর মানুষের ক্ষতি করেছিলুম একথা যদি স্বীকার করি, তাহলে আমার মুখে কালিলেপন হয়ে যাবে, কলঙ্ক লেপন হয়ে যাবে। তা কী করে হতে পারে! আমি কিছুতেই ভুল স্বীকার করৰ না। আর বলতে থাকৰ যে, না আমি ঠিকই করেছি। মানুষের ক্ষতি হয় হোক, আমার মর্যাদাহানি যেন না হয়। এই দু' রকমের মানুষ হয়। তোমরা যখন নব্যমানবতাবাদকে মানুষের ঘরে ঘরে দোরে দোরে পৌঁছে দেবে, তখন এই দু'রকম মানুষই পাৰে-যারা জেনে করেছিল আর যারা না জেনে করেছিল। তবে আশা করি যারা না জেনে এই যে স্যুডো- হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী ধরে চলেছিল-না

জেনে, জেনে নয়-তাদের অনেকেই ভুল বুঝে নেবে, ভুল শুধরে নেবে। আর তোমরা তাদের সাহায্যে অন্যের কল্যাণ করবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবে। একটু আগেই বলেছি, এর আগের দিনও বলেছি যে এই অন্ধকারের পরপারে তাদের তোমরা নিয়ে যাও, আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের সামনে এনে দাও, যাতে তারা সংশোধিত হয়ে মানুষের আরও বড় এ্যাসেটে পরিণত হয়, আরও বড় সম্পদে পরিণত হয়। আর, যারা বিরোধিতা করবে 'ইগো'তে ধাক্কা খেয়ে তারা কিছু করতে পারবে না। কারণ যারা 'ইগো'-র দ্বারা প্রেষিত হয় তাদের বুদ্ধিহানি ঘটে, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। 'ইগো' টাই বড় হয়ে যায়, বুদ্ধি কমে যায়। আর যার বুদ্ধি কম সে তো অনায়াসে হেরেই যাবে। তাই, তাদের জন্যে কোন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু জ্ঞাতসারে যারা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক পলিসি নিয়ে চলছে, স্যুডো- হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে দুনিয়াকে দেখেছে, তারা শোধরাতে চাইৰে না। বরং তারা আরও উগ্র, আরও উদগ্র হয়ে উঠবে। তারা ভাববে যে তাহলে তো আমার সৰ কেরামতি ধরা পড়ে গেছে! আমার তো আর লুকোনো কিছু রইল না! তখন তারা ক্ষেপে উঠবে। আর তাদের হাতে যত রকমের প্রচার মাধ্যম ('মাস মিডিয়া') আছে, যত শক্তি, যত সামর্থ্য, যত বোক্যালিটি, যা কিছু আছে...তূণীরে যতগুলি তীর আছে, সৰ প্রয়োগ করবে। কারণ, তখন তাদের

সামনে অন্য পথ নেই। হয়তো তারা শোধরাতে চাইতে পারে কিন্তু যদি শোধরাতেও চায় তারা দেখবে যে অতীতে তাদের যে বিরাট ইতিহাসটা ছিল, সেটা তো মসীলিপ্ত ও নিও-হিউম্যানিজমের কষ্টিপাথরে তা মেকি জিনিস, তা মরা সোণা বলে ধরা পড়ে গেছে। তবে এটাও ঠিক যে জাগ্রত বিবেক, জাগ্রত মানুষ তাদের চিনে নেবার পরে তাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে। কোন মমতা রাখবে না। এখন নিওহিউম্যানিষ্টিক যে এ্যাপ্রোচ– এই নিওহিউম্যানিজম্ কী তা ৰললুম যে হিউম্যানিটি হিউম্যানিজ়ম্ নিউলি এক্সপ্লেইন্ড-হিউম্যানিজম্ এক্সপ্লেইড এ্যাফ্রেশ। তা এই যে নিওহিউম্যানিজম্-এর পথে চলতে গেলে, একে বাস্তবায়িত করতে গেলে, কেমনভাবে চলতে হবে! অর্থাৎ নিওহিউম্যানিজকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কীভাবে চলতে হবে ও যারা স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্রাটেজী নিয়ে মানুষের অকল্যাণ করে এসেছে- জেনে বা না জেনে, তাদের বিরুদ্ধে কীভাৰে যুঝতে হবে।

দুটো প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত-উত্তরও তাই। এইভাবে চলতে গেলে দেখতে হয় যে মানুষের জীবনটা কেবল ফিজিক্যাল নয়, কেবল সাইকিক নয়, কেবল স্পিরিচুয়ালও নয়-তিনে নিয়ে জীবিত মানুষের অস্তিত্ব। এজন্যে এ্যাপ্রোচটাও হবে কী রকমের?-

না, প্রথম স্তর (ফার্স্ট ষ্টেজ) হবে, আমি নাম দিয়েছি স্পিরিচুয়াল কাল্ট। এই ফার্স্ট ষ্টেজটা কেমন হবে?-না, এই যে আমাদের কসমোলজিক্যাল অর্ডার-দিস এন্টায়ার কসমোলজিক্যাল অর্ডার (মহাবিশ্বের দ্যোতনা) এতে রয়েছে কী? না, ফিজিক্যালিটি রয়েছে, পাঞ্চভৌতিক উপাদান রয়েছে, জড়জগৎ রয়েছে। এই জড় জগতের যে পরিচালক-একটা ম্যাক্রো-সাইকিক এন্টিটি (বিরাট মানসিকতার অধীশ্বর পরমসত্তা) রয়েছে-আবার এই ম্যাক্রো- সাইকিক এন্টিটির পেছনে একটা ম্যাক্রো-স্পিরিট (অতি বিরাট চিতিশক্তি) রয়েছে। হ্যাঁ (This universe of ours is of macro-psychic co- nation.) হ্যাঁ, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট মানসিকতার সংবেদনাত্মক প্রসৃষ্টি)। সুতরাং মানুষকে চলতে গেলে ফিজিক্যাল ওয়ার্লড় (জড় জগৎ)-কে অস্বীকার করা চলবে না। ফিজিক্যাল ওয়ার্লডের যা কিছু অসঙ্গতি সেগুলোর সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে আর এই বিবেচনা করতে সাহায্য করবে মাইক্রো-সাইকিক একজিস্টেন্স (বিন্দু মানসিক আস্তিত্বিক চেতনা)। তারপরে মানসিক জগতে যা কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, অনেক মানুষ তার মেন্টাল পোটেনশিয়ালিটি (মানসিক সামর্থ্য) রয়েছে, কিন্তু কীভাবে চিন্তা করতে হয় সেই খাতটা, সেই রাস্তাটা, সেই ষ্ট্রীমটা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সে ভুল পথে চিন্তা করছে। ভুল চিন্তার ফলশ্রুতি হয় ভুল কর্ম। তা চিন্তার

ক্ষেত্রে কীভাবে তাকে চলতে হবে সেই ব্যাপারে সে কোন গাইড লাইন পাচ্ছে না। (He is not being properly goaded unto the path of macro-psychic entity, আমাদের একটা স্বভাব আছে, যে মানুষটার একটা কাজ খারাপ, উঠতে বসতে তার নিন্দে করি, তাকে হেনস্থা করি। আমাদের ভেবে দেখা উচিত, he suffers from a sort of micro-psychic ailment (সে এক ধরণের মানসিকতার রোগী)। তার সেই মাইক্রোসাইকিক এইলমেন্ট (মনোবিকারের রোগ) দূর করবার জন্যে তার সামনে আমাকে নিওহিউম্যানিষ্টিক ফিলজফি তুলে ধরতে হবে। আমরা তা করিনি, তাই আমরা অপরাধী। তারপরে সেই মাইক্রো-সাইকিক এন্টিটির উদ্ভূতি কোথা থেকে হচ্ছে! Micropsychic entity is a collection of a few ectoplasms, (অনেকগুলো চিত্তাণুর সমারোহেই বিন্দুমানসিক আস্তিত্বিক চেতনা তৈরী হয়) আর এই মাইক্রো-সাইকিক একটোপ্লাজম্ আসছে ম্যাক্রো-সাইকিক্ (মহামানসিক চেতনা সঞ্জাত প্রসৃষ্টি) হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে ও ম্যাক্রো-স্পিরিট থেকে পরোক্ষভাবে। এই দুটো কথা ভোলা চলে না। সুতরাং তার পেছনে যেমন মাইক্রো-সাইকিক স্তরে আমাদের প্রচারের দরকার তেমনি মানুষকে ঠিকভাবে চিন্তা করৰার উপাদান জুগিয়ে দেওয়া দরকার, ঠিকভাবে পথনির্দেশনার দরকার, তেমনি ম্যাক্রো-স্পিরিটের

দিকে যাৰার জন্যে ঠিকভাবে পথনির্দেশনা মাইক্রো-সাইকিক একটোপ্লাজত্কে দিতে হবে। আমরা তা দিইনি। তাই আমরা এ বিচারেও অপরাধী। মানুষ জাতকে গড়তে গেলে যেমনটি পথনির্দেশনা দেওয়া উচিত ছিল দর্শনে, প্রজ্ঞায়, বিজ্ঞানে-আমরা তা দিইনি। বিজ্ঞানের শুভ প্রয়োগের চেয়ে অশুভ প্রয়োগ বেশী করেছি, মানুষের চিন্তাধারাকে বিকৃত (distort) করে দিয়েছি, নির্দেশনা দেওয়া দূরের কথা, ভুল পথে চালিয়েছি। চিন্তা করতে শিখিয়েছি এই ৰোমাটা তৈরী করলে এক সঙ্গে এত লাখ লোক মরতে পারে। শেখাইনি যে এই ফিলজফিটা প্রচার করলে, এই ধরণের মানসিক তথা আধ্যাত্মিক জগতে দিক্ দর্শন দিলে এক সঙ্গে দশ লাখ লোক উপকৃত হবে। ভুল পথে মানুষ চলেছে। আজ তার পথ সংশোধনের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, তার একমাত্র পাথেয়, পথের কড়ি হচ্ছে নিওহিউম্যানিজম-নব্যমানবতাবাদ। এই পথে চলতে গেলে তিনটে সোপান রয়েছে, তিনটে ধাপ রয়েছে। প্রথম সোপানটা হচ্ছে কী?-না, সেটা হচ্ছে স্পিরিচ্যুয়াল কাল্ট (spiritual cult)। হোয়াট ইজ স্পিরিচ্যুয়াল কাল্ট? ইট ইজ ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল কাল্ট (জড়-মানসিক- আধ্যাত্মিক নিত্যপ্রয়াস)। এই যে ফিজিকো-সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল, এ মানুষকে যেমন জড়জগতের ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধন করবার নির্দেশনা দেবে, তার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা জগতের

ত্রুটি শোধরাবার নির্দেশনা দেবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেৰে যে অযথা কালক্ষেপ না করে স্পিরিচ্যুয়াল গোলের দিকে এগিয়ে চল। কারণ স্পিরিচ্যুয়াল গোলের দিকে অগ্রগতি তোমাকে প্রকারান্তরে সাইকিক জগতে ও ফিজিক্যাল জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। তুমি মানুষকে অধিকতর উপকৃত করতে পারবে। It is what is called, what I call spir- itual cult. একেই আমি বলি আধ্যাত্মিক নিত্যপ্রয়াস। এই স্পিরিচ্যুয়াল কাল্টের অগ্রগতি শুরু হবে মানুষের অস্তিত্বের প্রোটোপ্লাজমিক সেল থেকে ও এর চরম নিষ্পত্তি হবে পরমা প্রাপ্তিতে। এই যে ফিজিকো- সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল কাল্ট-যার নাম দিচ্ছি স্পিরিচ্যুয়াল কাল্ট-এ ফিজিক্যাল ওয়ার্লকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে, সাইকিক ওয়ার্লত্রে সাইকিক-কে প্রত্যক্ষভাবে, ফিজিক্যালকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে ও স্পিরিচ্যুয়াল পোটেনশিয়ালিটিসের স্পিরিচ্যুয়ালকে প্রত্যক্ষভাবে আর সাইকিক্ ও ফিজিক্যালকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাবে। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এহ বাহ্য আগে কহ আর। আরও এগিয়ে চল- "হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। দ্বিতীয় ধাপটার আমি নাম দিয়েছি spiritual spirit or essence, ie, spiritual essence- আধ্যাত্মিকতার সারমর্ম, নিগূঢ়তত্ত্ব। এই ক্ষেত্রে কাজ হৰে মুখ্যতঃ সাইকিক (মানসিক) আর স্পিরিচ্যুয়াল (আধ্যাত্মিক) স্তরে।

মানুষ জাতিকে সামগ্রিক ভাবে দেখলে মানুষের একটা সামগ্রিক মন রয়েছে-collective mind, not the cosmic mind but the collective mind. এই যে কালেক্টিব মাইণ্ড, এর যে চিন্তার স্রোত চলেছে, চিন্তাজগতে উহ- অবোহ চলেছে-এতেও তো পরিবর্তন আনতে হবে। সামূহিক মানব মনেতে নোতুন ধরণের চিন্তার যোগান দিতে হবে। এযাবৎ মানুষ যেভাবে ভেবে চলেছে তাতে মানুষের উন্নতির গতি খুবই কম হয়েছে। সুতরাং একে যদি নোতুন মোড়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় উন্নতি আরও ত্বরিত, আরও ত্বরান্বিত হবে। তাই এই যে দ্বিতীয় ধাপটা যার নাম দিচ্ছি স্পিরিচ্যুয়াল এসেন্স-এ কাজ করবে সাইকিক স্পিরিচ্যুয়াল দুটোতে। আর এ কাজ করবে কালেক্টিব সাইকিক মাইণ্ডে অর্থাৎ কালেকটিব একটোপ্লাজুম্ অব্ এন্টায়ার হিউম্যানিট–তার মধ্যে কাজ করবে। অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর ঠিক তেমনি মানুষের যে কালেকটিব স্পিরিট সেই কালেকটিব স্পিরিট-এ শক্তির যোগান দেবে। মানুষ মিলিতভাবে একটি আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। তখন সে অবস্থায় আর কোন স্যুডো-হিউম্যানিষ্টিক স্ট্র্যাটেজী কাজ করবে না। ব্রহ্মাস্ত্রের সামনে আর সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও আছে। যাকে আমি নাম দিয়েছি স্পিরিচ্যুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন। প্রথমে শুরু হ'ল স্পিরিচ্যুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট; দ্বিতীয়

ধাপ স্পিরিচ্যুয়ালিটি ইন এসেন্স বা স্পিরিট্ ও তৃতীয় ধাপ হ'ল স্পিরিচ্যুয়ালিটি এ্যাজ এ মিশন। যত কিছু সত্তাগত কর্মায়ণ (existential phenomena) আছে সৰ উৎসারিত হচ্ছে একটা আস্তিত্বিক চক্রনাভি (Existential Nu- cleus) থেকে। আর একটি মানুষের এই এজিষ্টেনসিয়াল নিউক্লিয়াস প্রত্যক্ষ যোগ (direct link) রেখে চলেছে কার সঙ্গে?-না, কসমো লজিক্যাল অর্ডারের যা নিয়ন্তাবিন্দু (Controlling Point) তার সঙ্গে,- a direct link with the Cosmological Hub, a direct link with the Existential Nucleus of the Cosmological order (১৩ বিশ্বের দ্যোতনার সঙ্গে তার চক্রনাভির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে)। এ পথ সাইকো-স্পিরিচ্যুয়াল নয়। নিওহিউম্যানিজমের এই যে চরম তথা পরম পথটা হচ্ছে যে ইউনিটের এক্সিষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসকে কসমিকের এজিষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসের সঙ্গে কোইনসাইড করিয়ে দেওয়া (অণুবিন্দুর সঙ্গে মহাবিন্দুকে মিলিয়ে দেওয়া–তন্ত্রের ভাষায় নাদবিন্দু যোগ), এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়া। তার ফলটা হবে কী? The entire existential order of unit being becomes one with the Controlling Nucleus of the existential order of the Supreme Entity of the Cosmological order (এককত্বের সমস্ত চক্রাধারকে বিশ্বদ্যোতনার মহাচক্রনাভিতে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে এককত্বের অবযন্ত্রণা থেকে

মহানিষ্কৃতির সম্প্রাপ্তি) ও সেই অবস্থাতেই আসবে নিওহিউম্যানিজমের চরম প্রদ্যুতি। আর সেই নিওহিউম্যানিষ্টিক ষ্ট্যাটাস কেবল মানুষকেই বাঁচাৰে তা নয়, জীবজগৎ-উদ্ভিদজগৎ সবাইকেই বাঁচাবে। আর সেই যে সুপ্রীম নিওহিউম্যানিষ্টিক স্ট্যাটাস (নব্যমানবতাবাদের পরমাস্থিতি) সেই পরমাস্থিতিতে পৌঁছে যাবার পরে বিশ্বমানব, মানুষ তার অস্তিত্বের চরিতার্থতায় পৌঁছে যাবে। তখন মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছু থাকবে না, মানুষ সব কিছু করতে পারবে। আজকের মানুষ, হতাশাগ্রস্ত মানুষ নিজের ইম্পারফেশনের কথা, অসম্পূর্ণতার কথা বড্ড বেশী ভাবে-আমি কি পারব? কিন্তু তখন তা না। হ্যাঁ, আই এ্যাম এ নিওহিউম্যানিষ্টিক ৰিয়িং, পারবার জন্যেই তো আমি পৃথিবীতে এসেছি। আমি কি পারৰ-সে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? অনেক কাল আগে পুরুলিয়ায় গেছলুম। সঙ্গে একটা ভারী মোট ছিল। একজন গ্রাম্য লোককে আমি শুধিয়েছিলুম, "আরে, মোটটা নিয়ে যেইত্যে পাইরৰি, না লারৰি!" সে বললে, "লাৱৰ কেনে গো, পাইরৰ” । আমার ভারী ভাল লেগেছিল। আর আমি জানি এই নিওহিউম্যানিজম একদিন পৃথিবীর সব মানুষের মুখ দিয়ে বলাৰে যে "লাৱৰ কেনে গো-পাইরৰ।" আর মানুষ পারবে। আর সেই দিন কোন জিও-সেন্টিমেন্ট ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। কোন সোসিও-সেন্টিমেন্ট মানুষের সমাজে ভেদবুদ্ধির প্রাচীর

গড়তে পারবে না। আর হিউম্যানিজমের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের বিশ্বাসের অবমাননা করে লাখ লাখ মানুষের ক্ষতি করতেও কোন দানব (demon) পারবে না। আর সেই যে সদাজাগ্রত হিউম্যান এনটিটি-ফিজিকো-সাইকো- স্পিরিচ্যুয়াল এনটিটি- যখন তার চরম তথ্য পরম অবস্থায় পৌঁছে তার একিজষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসকে সুপ্রীম এজিষ্টেনশিয়াল নিউক্লিয়াসে মিশিয়ে দেবে, তখন নিওহিউম্যানিজম্, পাৰে তার স্থায়ী ভিত্তিভূমি। আর সেই অবস্থাতেই নিওহিউম্যানিজমের হৰে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। আর মানুষ চিরদিনের জন্যে মুক্তির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ সেদিন বলবে, পৃথিবীতে এসেছি কাজ করতে, আর সব মানুষের সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায়, সর্বজন কল্যাণার্থং-সৰাইকে অন্ধকার থেকে টেনে নিয়ে আলোর দিকে নিয়ে চলতে। যদি কেউ বলে আমার অন্ধকারটাই ভাল তাকে বলব, ঠিক আছে তোর অন্ধকারটাই ভাল কিন্তু একবার আলোর সামনে এসে দেখ, সেটা আরও ভাল।

(কলকাতা, ২৯শে মার্চ, ১৯৮২)

সূচীপত্র